কিশোর

শ্রীজলধর সেন প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী,
কলিকাতা ও ঢাকা।

১৩২৭ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত,
৫৭।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,
বাণী প্রেস,
১২।১নং, চোরবাগান লেন,—কলিকাতা।

উপহার পৃষ্ঠা
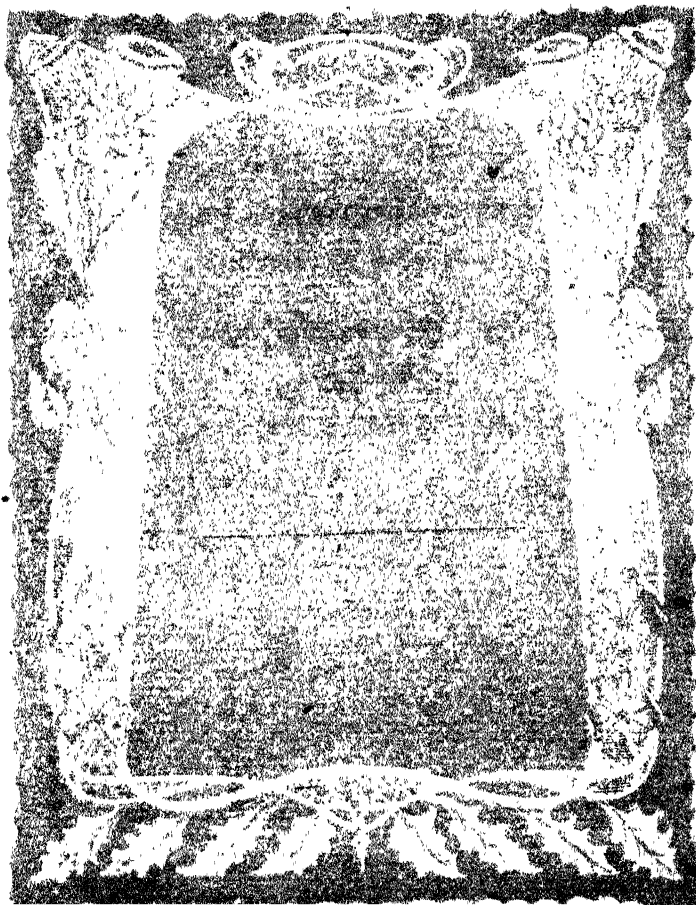
উৎসর্গ পত্র।

সোদরোপম

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বি, এ, বার্-এট্-ল

করকমলেষু।

আপনার মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীব, বিদ্বান ও পণ্ডিত অনেক আছেন; সে কথা ভাবিয়া এই ক্ষুদ্র বইখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিতেছি না। আপনার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরহিতব্রত, কোমল-হৃদয় ব্যক্তি বড়ই কম দেখিতে পাওয়া যায়। আপনার এই সকল সদ্গুণ স্মরণ করিয়াই আমি এই বইখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিতেছি। দরিদ্র ভ্রাতার এই অকিঞ্চিৎকর উপহার আপনি সহাস্যবদনে গ্রহণ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

কলিকাতা।
১৯১৫।

শ্রীজলধর সেন।

নিবেদন

"কিশোরে" প্রকাশিত গল্প কয়েকটির অনেকগুলিই "ধ্রুব" নামক মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, দুইটি গল্প "মুকুলে" লিখিয়াছিলাম। সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া এই বইখানি ছাপাইলাম।

আমি দেখিয়াছি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এখন প্রথমে উপকথা, ঠাকুমার-ঝুলি প্রভৃতি পাঠ করে; তাহার পরই তাহারা একেবারে দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ বা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস চাপিয়া ধরে। এই দুই শ্রেণীর পুস্তকের মাঝখানে আর কোন রকম গল্প-পুস্তক পায় না বলিয়াই তাহারা এই কার্য্য করিয়া থাকে। কিশোর-কিশোরীদিগের এই অভাব পূরণের জন্য আমার এই প্রয়াস। প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে কি না, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব।

আমার সাহিত্য-সখা, সুখদুঃখের সঙ্গী, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় এই সামান্য পুস্তকের একটা দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বন্ধু-প্রীতি-অন্ধতার নিদর্শন বলিয়া সকলে গ্রহণ করিলেই আমার প্রতি সুবিচার করা হইবে।

পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃভক্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতা,
১৩২১

শ্রীজলধর সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

'কিশোরে'র দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। ছয় বৎসর পরে, এই কাগজের মহার্ঘতার দিনে, দ্বিতীয়বার এই বইখানি ছাপাইবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না; কিন্তু ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত আমার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণের আয়োজন করিলেন।

আমি মনে করিয়াছিলাম যে, কিশোরদিগের জন্য আরও কিছু লিখিব; কিন্তু, এখন দেখিতেছি, আমাদের দেশে কিশোর অবস্থাটা মোটেই নাই,—বালক একেবারেই যুবক হইয়া বসে; সুতরাং কাহাদের জন্য আর বই লিখিব।

কলিকাতা,
১৩২৭

শ্রীজলধর সেন

ভূমিকা

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক, সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত-সীমায় পদার্পণ করিয়া স্বদেশীয় কিশোর-কিশোরী-গণের জন্য তাঁহার স্বাভাবিক সরল ভাষায় এই সুন্দর গল্প-পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং মাতৃভাষার এই নগণ্য সেবকের উপর ইহার ভূমিকা লিখিবার ভার দিয়া আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছেন। জলধর বাবুর ন্যায় শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদের জন্য বিপন্ন হইতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তির স্কন্ধে এই গুরুভার অর্পণ করিয়া বহুদর্শী প্রবীণ লেখক যে বিচার-মূঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। এ বয়সে সাহিত্য-সমাজে তাঁহার অকারণ হাস্যাস্পদ হইবার প্রবৃত্তি কেন হইল, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।—বঙ্গ-সাহিত্যের দরবারে যাঁহারা বঙ্গবাণীর শ্রেষ্ঠ উপাসক বলিয়া প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছেন, সমালোচনায় যাঁহারা সিদ্ধহস্ত, গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের সৌন্দর্য্য ও ভাব-বিশ্লেষণের শক্তি যাঁহাদের অসাধারণ, তাঁহারাই এই সুন্দর গল্পপুস্তকখানির ভূমিকা লিখিবার যোগ্য পাত্র; বঙ্গসাহিত্যের ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ বর্ত্তমানে "শল্যকে" রথীপদে বরণ করিয়া তাঁহার কোনও ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহা যে তিনি জানেন না, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে একটা কথা আছে; তাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা হইলেও এখানে বোধ হয় বলিতে দোষ নাই। পল্লীগ্রামের অখ্যাত, বৈচিত্র্য-বিহীন, নিভৃত গৃহকোণ হইতে জলধর বাবুকে সাহিত্যের দরবারে বাহির ও জাহির করিবার জন্য যদি কাহাকেও দায়ী হইতে হয়,—তবে সে জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথমে আমার দিকেই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিবেন। ইহা অপরাধ হইয়া থাকিলে, এ অপরাধ আমি শ্লাঘার বিষয় মনে করি। কারণ

এ অপরাধে আমি লিপ্ত না হইলে বঙ্গীয় পাঠকসমাজ এই দীর্ঘকাল জলধর বাবুর সরস ও সুমিষ্ট রচনায় পরিতৃপ্ত হইবার সুযোগ পাইতেন কি না সন্দেহ। তিনি খ্যাতি বা অখ্যাতি উপার্জ্জনের আশায় নিজের চেষ্টায় বঙ্গসাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করিতেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; এবং তিনি এই পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেতের বয়সে যেরূপ উৎসাহের সহিত অক্লান্ত পরিশ্রমে মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া এই উৎসাহ ও শক্তি সুদীর্ঘকাল তাঁহার হৃদয়ে সুপ্ত ছিল, এ কথাও সহসা কেহ বিশ্বাস করিতেন না।

জলধর বাবুর রচনা দীর্ঘকাল হইতে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের সুপরিচিত, সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহার রচনাভঙ্গির বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য নির্দ্দেশ করা নিতান্তই বাহুল্য মনে হয়। স্পষ্টবাদী, নির্ভীক ও ছিদ্রান্বেষী সাহিত্য-সমালোচকগণ তাঁহার রচনায় অনেক দোষ দেখাইতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহার ভাষা যে স্বচ্ছ, সরল, আড়ম্বর-বর্জ্জিত, সুমিষ্ট ও হৃদয়স্পর্শী, ইহা তাঁহারাও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। চরিত্রের পবিত্রতা, আন্তরিকতা, সেবাপরায়ণতা ও শুদ্ধবুদ্ধি মানব-জীবনের অলঙ্কার,—জলধর বাবুর যে কোনও রচনার স্বচ্ছদর্পণে মানব-চরিত্রের এই সকল সদ্‌গুণ প্রতিফলিত দেখা যায়। আমার যতদূর স্মরণ হয়—অনাবশ্যক কৌতূহল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কখনও কোনও গল্পের অবতারণা করেন নাই; এবং তিনি যখনই যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে উপদেষ্টার ন্যায় কর্ত্তব্য-নীতির পথ নির্দ্দেশ করেন নাই, বিনীত শিষ্য ও ভাবগ্রাহী সেবকের ন্যায় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াই অনেক গুরুতর সমস্যার সমাধান করিয়াছেন; এ কালে, অহমিকার এই আস্ফালনের দিনে, যে ভাবে তিনি "বার হাত শশার তের হাত বিচি" দেখাইয়াছেন, সকলের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় কি না সন্দেহ।

যাহা হউক, জলধর বাবু এই বৃদ্ধ বয়সে ছেলেদের জন্য কেন "কিশোর"

প্রকাশিত করিলেন, সে কৈফিয়ৎ তিনিই দিবেন। কিঞ্চিৎ অর্থলাভ এবং তৎসঙ্গে গালাগালি বা বিদ্রূপ "উপরি লাভ" উদ্দেশ্য হইলে তিনি সম্ভবতঃ বিষয়ান্তরে হস্তক্ষেপ করিতেন, কিশোর-জীবনের এই আলেখ্য অঙ্কিত করিতেন না।

কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই হউক, কিশোর-কিশোরীগণের পাঠোপযোগী গল্পপুস্তক রচনার অধিকাব তাঁহার আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তিনি জননী বীণাপাণির "বেতস কুঞ্জ" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেও, দন্তোদ্গমের প্রারম্ভকাল হইতেই বাঙ্গালা রচনায় প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক কাঙ্গাল হরিনাথের সাগ্‌রেদী আরম্ভ করেন। এই সিদ্ধপুরুষের নিকট যাঁহারা রচনা-শিক্ষায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের লেখনী-ধারণ ব্যর্থ হয় নাই। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক সুধীবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণাব নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন ;—আর জননী "সর্ব্বমঙ্গলার" ভক্তসেবক সাধকপ্রবর বিদ্যার্ণব শিবচন্দ্র ভাব-মন্দাকিনী-পূত ভক্তিরসসিক্ত সরস রচনায় যে মধুরতা, যে ঐকান্তিকতা, ও আবেগ ঢালিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয় প্রদানের এ স্থান নহে। সেই কাঙ্গালের যোগ্য শিষ্য জলধর বাবুর লেখনী-ধারণ বৃথা হইবে, আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের কাঙ্গাল ভক্তেরা ইহা বিশ্বাস করিবে না।

জলধর বাবু ছাত্রগণের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া ছাত্রেরা ভয়ে "কম্পান্বিত-কলেবর" হইত না ; তাঁহাকে বন্ধু মনে করিত, অসঙ্কোচে তাঁহাকে তাহাদের সুখ দুঃখের কথা বলিত ; অন্যে বেত্র-প্রয়োগে যে সকল দুর্ব্বিনীত অসংযত-চরিত্র ছাত্রগণের শাসনে সমর্থ হইতেন না, জলধর বাবু মিষ্ট কথায় মধুর উপদেশে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত করিতেন। মাষ্টার মহাশয় মনে কষ্ট পাইবেন, ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিত না। সুদীর্ঘকাল জলধর বাবু কত-স্থানে কতশত বালকের শিক্ষকতা করিয়াছেন,

তাহার হিসাব দাখিল করিবার আবশ্যক নাই ; কিন্তু তাঁহার এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হয় নাই। তিনি প্রায় দুই যুগ কাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে যাহাদের সহিত মিশিয়াছেন, যাহাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত নিত্য পরিচিত হইয়াছেন, এবং যাহাদের হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব ও সুকোমল বৃত্তি সহানুভূতির তুলিকায় স্বীয় হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদেরই চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া এত দিন পরে এই প্রাচীন বয়সে তিনি কয়েকখানি উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন ; এবং বিচিত্র বর্ণরাগে ও ভাব-তুলিকা-সংস্পর্শে তাহা এমন মনোরম হইয়াছে যে, সেগুলি বঙ্গ-সাহিত্যের দরবার-মণ্ডপের শোভা সম্পাদনের সম্পূর্ণ যোগ্য, এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। বস্তুতঃ, 'কিশোরে' তিনি বঙ্গীয় কিশোর-জীবনের যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন,—তাহা কেবল কিশোর-কিশোরীগণের নহে, তাহাদের পিতা পিতামহগণেরও চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইবে।—'কিশোরে'র কোনও গল্পেই নির্ম্মল সাহিত্য-রসের অভাব নাই।

জলধর বাবুর এই গল্পগুলি বালক বৃদ্ধ সকলেরই চিত্তরঞ্জন করিবে কেন, ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কোন জিনিস কেন ভাল লাগে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়াও কঠিন। কিশোরের প্রথম গল্প "মায়ের বলি" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ গল্প "পূজার পোষাক" পর্য্যন্ত গল্পগুলির অধিকাংশেই পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের এক একটি নূতন চিত্র সুপরিস্ফুট ; আমাদের ন্যায় পল্লীবাসীর নিকট তাহা অত্যন্ত সাধারণ,—সকলেরই অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয়। তাহাদের কোথাও অতিরঞ্জনের চেষ্টা নাই, কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই ; যেন এক-একটি সরল সুন্দর গৃহস্থজীবনের স্বাভাবিক ছবি ঐন্দ্রজালিকের ইঙ্গিতে আমাদের কল্পনা-নেত্রের সম্মুখে মায়াচিত্রের ন্যায় ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়া বায়স্কোপের ছবির মত নয়ন-পথের অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক লেখকের

অদ্ভুত শক্তিতে করুণা ও সহানুভূতি হৃদয় পূর্ণ করিয়া কি এক অব্যক্ত বেদনায় চোখের পাতা আর্দ্র করিয়া তুলিতেছে। শুনিয়াছি বিলাতী "নাইটিংগেল" পাখী কাঁটার উপর বুক রাখিয়া গান করে; সে গানে সকলেই মুগ্ধ হয়। জলধর বাবুর জীবন সুখের জীবন নহে। শান্তির সন্ধানে তিনি লক্ষ্যহারা উল্কার ন্যায় জীবনের দীর্ঘকাল কোথায় না ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন! কিন্তু তাঁহার প্রিয়-বিরহ-ক্ষুব্ধ প্রবাসী-জীবন কোথাও গিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে নাই; "নাইটিংগেলের" ন্যায় কণ্টকবিদ্ধ বক্ষে তিনি গান গাহিয়াছেন, তাই সেই গান আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। জলধর বাবু যদি তাঁহার এই ক্ষুদ্র গল্পপুস্তকে পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করিতেন, মাটির প্রদীপে গরীবের পর্ণ-কুটীর আলোকিত না করিয়া, যদি সেখানে বিলাতী এসেটিলিন গ্যাসের আমদানী করিতেন, বর্ণনাচ্ছটায় ভাবের দৈন্য ঢাকিয়া কালোয়াতের মত কেবল রাগিণী ভাঁজিয়াই শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে হয় ত সমালোচকের কণ্ঠ হইতে বিস্তর "বাহবা" উদ্গীরিত হইত; কিন্তু এমন করিয়া তিনি চোখের পাতা ভিজাইতে পারিতেন না। এইখানেই তাঁহার রচনার সার্থকতা। অথাত পল্লীজীবনের নিখুঁত চিত্র হিসাবে 'কিশোরে'র এই গল্পগুলি অতুলনীয় হইয়াছে; এবং জলধর বাবুর বিশেষত্ববিহীন বেদনাভরা ব্যর্থ-জীবনের সহিত এই গল্পগুলি চমৎকার খাপ খাইয়াছে। এই তুচ্ছ কথা কয়েকটি বলিবার জন্যই 'কিশোরে'র ভূমিকা-রূপে এই কয়েক পৃষ্ঠার অবতারণা; কিন্তু শক্তির অভাবে কথা কয়টি যেমন ভাবে বলা উচিত ছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ। ইতি—

মেহেরপুর,
নদীয়া

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সূচীপত্র

কিশোর

—০—
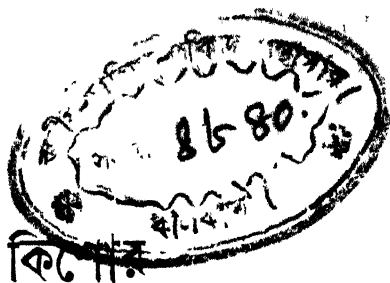
মায়ের বলি

মতি সেখ যে জাতিতে মুসলমান, তাহা তাহার সেখ উপাধি দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ। তাহার বাড়ী হাতি-শালা গ্রামে। গ্রামটী খুব বড়ও নহে, খুব ছোটও নহে। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য হিন্দু জাতির বাস। দশ পনর ঘর মুসলমানও এই গ্রামে বাস করে। তাহারা হিন্দুদিগের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়াই থাকে; হিন্দু-মুসলমানে কোন গোলমাল এ গ্রামে কখনও হয় নাই।

মতি জাতিতে মুসলমান হইলেও তাহার বাড়ীর অনতি-দূরেই শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিনাজপুর জেলার এক জমিদারের ম্যানেজারী কার্য্য করেন। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় অবকাশের অভাবে তিনি প্রায়ই বাড়ী আসিতে পারেন না;

কিন্তু মনিবের সহস্রে কার্য্য থাকিলেও দুর্গাপূজার সময় তাঁহার বাড়ী আসা চাই-ই চাই। বৎসরান্তে পূজার সময় তিনি বাড়ীতে আসিয়া খুব ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করেন; গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদ ত আছেই, তাহার উপর পূজার তিন দিন তিনি গ্রামের কাহারও বাড়ীতে হাঁড়ি চড়াইতে দেন না; তিন দিন কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই চাটুয্যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে পূজা উপলক্ষে চাটুয্যে বাড়ীতে মহিষ-বলি হইত; কিন্তু একবার না কি বলির সময় খাঁড়া 'বাধিয়া' যায়, অর্থাৎ খড়্গের এক আঘাতে মহিষের শির দেহচ্যুত হয় নাই, সেই জন্য চাটুয্যে বাড়ী হইতে মহিষ-বলি উঠিয়া গিয়াছে, তাই এখন ছাগ-বলি লইয়াই মা দুর্গা সন্তুষ্ট থাকেন।

আমরা যেবারের কথা বলিতেছি সেবার দেশে বড় অজন্মা হইয়াছিল—টাকায় ছয় সের মোটা চাউল বিক্রয় হইয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যও বড় দুর্ম্মূল্য হওয়ায় দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে হাহাকার উঠিয়াছিল।

কিন্তু সেজন্য ত আর দুর্গোৎসব বন্ধ থাকিতে পারে না। আশ্বিন মাসে পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিল। যাঁহারা পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবার পূজার সাত আট

দিন পূর্ব্বেই বাড়ী আসিয়াছিলেন, এবং যথারীতি পূজার আয়োজন করিতেছিলেন।

একদিন অপরাহ্ণকালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই তিন জন আশ্রিত অনুগত ভদ্রলোক আছেন। তাঁহারা যখন মতির বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, মতির উঠানে একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণবর্ণ ছাগ দাঁড়াইয়া আছে। একজন ভদ্রলোক সেই ছাগটী দেখিয়া বলিলেন, "বাঃ, বেশ পাঁঠাটা। এই রকম কালো পাঁঠা মায়ের নিকট বলি দিলে সত্যসত্যই বলি দেওয়া সার্থক হয়।"

ভদ্রলোকটীর এই কথা শুনিয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মতির উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সত্যসত্যই ছাগটী বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তিনি তখন ভদ্রলোকটীকে বলিলেন, 'মিত্তিরজা, দেখ ত ভাই, মতি বাড়ীতে আছে কি না? তার কাছ থেকে এই পাঁঠাটা কিনে নেওয়া যাক্।" চাটুয্যে মহাশয়ের কথা শুনিয়া মিত্র মহাশয় মতির উঠানের উপর যাইয়া "মতি, ঘরে আছ?" বলিয়া দুই তিন বার ডাকিতে একটী সাত আট বৎসরের বালক বাহিরে আসিয়া বলিল, "বাবা ত বাড়ীতে নেই, নালাপাড়ার হাটে গেছে।"

মিত্র মহাশয় তখন বলিলেন, "তোর বাপ বাড়ীতে এলে

ঠাকুর-বাড়ীতে একবার যেতে বলিস্। কর্ত্তা তাকে ডেকেছেন। মনে থাকে যেন, ভুলিস্ না।" বালক বলিল, "তা, বাবা এলেই আমি বল্‌ব।"

(২)

পরদিন প্রাতঃকালে মতি সেখ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তাকে সেলাম করিয়া বলিল "কর্ত্তা মশাই কি আমাকে তলব দিয়েছেন?"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ মতি, তোমাকে ডেকেছি। তা বেশ, ঐ কল্‌কেটা নিয়ে একটু তামাক সাজ।"

মতি কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে গেল। গ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোক সকলেই জানিত যে, চাটুয্যে মহাশয় নিজে খাইবার জন্য তাহাদিগকে তামাক সাজিতে বলিতেন না; এ তামাক সাজার অর্থ এই যে, তাহারা তামাক সাজিয়া নিজেরা খাইবে। মতি তামাক সাজিয়া বেশ করিয়া দুই তিনটা দম দিয়া কলিকাটী আনিয়া কর্ত্তার সম্মুখে মাটীতে রাখিল।

কর্ত্তা বলিলেন, "মতি, বোসো। দেখ মতি, কাল দেখ্‌লাম তোমার উঠানে বেশ বড় একটা পাঁঠা রয়েছে। সেটা কি তোমার?"

মতি বলিল, "কর্ত্তা মশাই, ওটা ত আমার নয়, আমার

ছেলে মিয়াজান ওটাকে বুকে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। ওটা তারই।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তার হ'লে সে ত তোমারই হ'ল। তা দেখ, পাঁঠাটা আমার কাছে বিক্রয় কর। আমি ওটাকে মায়ের বলিতে লাগিয়ে দিই।"

মতি হাতযোড় করিয়া বলিল, "কর্ত্তা মশাই, ওটা মিয়াজানের। সে আজ এই দেড় বছর ওটাকে পুষচে। সে নিজের হাতে ওকে খাওয়ায়, নিজে ওর গা মুছিয়ে দেয়, সারাদিন ওকে নিয়ে খেলা করে। সে ত ওকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। তা, ওটা কেন? আপনার দরকার হয়, আমি ওর থেকেও ভাল একটা পাঁঠা, কেবল একটা কেন, আপনি যে ক'টা চান, তল্লাস ক'রে এনে দিচ্ছি। ওটা আমরা বেচতে পারব না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "আরে, পাঁঠা ত বার চৌদ্দটা কিনে আনা হ'য়েছে। পাঁঠার অভাব কি? তবে কি না, ঐ পাঁঠাটা দেখে আমার ইচ্ছে হয়েছে যে, ওটাকেই মায়ের ভোগে লাগাই; তাই ওটা চাচ্ছি, নইলে দেশে কি আর পাঁঠা মেলে না, না, আমি নিজের লোক দিয়ে কিনে আনাতে পারিনে?"

বৃদ্ধ দোকড়ি কর্ম্মকার সেখানে উপস্থিত ছিল। সে

গরীব মানুষ। সে চাটুয্যে মশায়ের কাছে কিছু লাভের আশায় আসিয়াছিল। কর্ত্তাকে খুসী করিবার জন্য সে বলিল, "মতি, ওতে আর আপত্তি কোরো না ; কর্ত্তার ইচ্ছা হয়েছে, পাঁঠাটা মায়ের কাছে বলি দিবেন ; তাতে কি অমত করতে আছে ? আর কর্ত্তা ত অমনি চাইছেন না, ন্যায্য দাম নিয়ে পাঁঠাটা এনে দিয়ে যাও।"

মতি যখন চাটুয্যে বাড়ীতে আসে ঠিক সেই সময় গ্রামের জমিদারের পাইক খাজনার তাগাদায় তাহার বাড়ী গিয়াছিল, এবং মতি যদি দুই দিনের মধ্যে তাহার বাকি খাজনা না দেয়, তা হ'লে তার ভাল হবে না বলিয়া সে ভয় দেখাইয়াছিল। সেই খাজনার কথা মতির মনে হইল। তখন তাহার ঘরে এমন একটা পয়সা ছিল না যে, একটু লবণ কিনিয়া আনে,—খাজনা দেওয়া ত দূরের কথা। তিন সের পাট লইয়া পূর্ব্বদিন সে হাটে গিয়াছিল। পাট বিক্রয় করিয়া যাহা পাইয়াছিল, তাহা দিয়া হাট করিয়া আসিয়াছে। তাহার ঘরে এমন কোন দ্রব্য ছিল না, যাহা বেচিয়া সে খাজনার সাড়ে তিন টাকা দুই চারি দিনের মধ্যে জমিদারের কাছারিতে দিয়া আসিতে পারে। আর শুধু খাজনা দিলেই ত চলিবে না, পেট চলাও ত চাই। এই খাজনার কথা তাহার মনে হইলে সে ভাবিল পাঁঠাটার উপর যখন

কর্ত্তার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন তার দাম সাড়ে তিন টাকা চাহিলেও কর্ত্তা তাতেই রাজি হইবেন। তাহা হইলে আর তাহাকে খাজনার জন্য ভাবিতে হইবে না, জমিদারের পাইকের কাছে গালাগালি খাইবারও ভয় থাকিবে না। কিন্তু পরক্ষণেই মিয়াজানের কথা তাহার মনে হইল। আহা! মিয়াজান যে পাঁঠাটাকে বড় ভালবাসে। পাঁঠাটাকে না দেখিলে যে সে কাঁদিয়া খুন হইবে! তাহাকে কি বলিয়া সে সান্ত্বনা দিবে? মতি এই রকম নানা কথা ভাবিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন, "তা দেখ মতি, তুমি এ বেলা বাড়ী যাও। বিকেলে যা হয় কোরো। তবে কি না, তোমার ঐ পাঁঠাটা আমার চাই। আর সত্য কথা ব'লতে কি, মায়েরও ইচ্ছা, ঐ পাঁঠাটাই তাঁর কাছে বলি দিই। তাই যদি না হবে, তবে রাজ্যে এত পাঁঠা থাক্‌তে আমার দৃষ্টি তোমার ঐ পাঁঠাটার উপরই বা পড়বে কেন? কি বল, দোকড়ি ভায়া!"

কর্ত্তার মোসায়েব দোকড়ি ভায়া অমনি বলিল, "সে ত ঠিক কথা—এতে কি আর কোন সন্দ আছে? মতি, তুমি ও পাঁঠাটা কর্ত্তাকে দিতে অমত করো না। মা ঐ পাঁঠাটাই বলি চান, তাই ত কর্ত্তার ওটার দিকেই নজর

পড়েছে। ঠিক কথা—ঠিক কথা। মা ঐ পাঁঠাটাই চান বটে! ঐ শোন টিকটিকিটাও বল্‌চে—টিক্‌ টিক্‌ টিক্‌।”

মতি বলিল, “কর্ত্তা মশাই, তবে এখন আসি। সেলাম! বিকেলে যা হয় ব'লে যাব।”

দোকড়ি বলিল, “আর বলাবলি কিছু নেই মতি! মায়ের বলি, এতে অমত কোরো না। চাটুয্যে মশাই আছেন, তাই আমরা গাঁয়ের দশজন বেঁচে আছি। বিপদ হোক, আপদ হোক, এসে দাঁড়ালেই হোল; কর্ত্তার দয়ায় আমরা অকূলে কূল পাই, তা জান·ত বাপু! আর কোন ওজর আপত্তি না ক'রে ওবেলাই পাঁঠাটা নিয়ে এস, যা ন্যায্য দর হবে, তাই পাবে। এ সংসারে টাকার ত অভাব নাই, আর চাটুয্যে মশাইও তেমন লোক নন; এক কথার মানুষ, তোমাকে আর বেশী বল্‌তে হবে কেন? তুমি ত সবই জান।”

মতি বলিল, “তা আর জানিনে? ওনার ‘হিল্লেই’ আছি ব'লেই ত এত দিন বাপ-দাদার ভিটেয় টিকে আছি। তবে এখন আসি, কর্ত্তা মশাই সেলাম! কর্ম্মকার মশাই, সেলাম!” মতি কর্ত্তার নিকট বিদায় লইয়া নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে চলিল।

(৩)

মতি বাড়িতে আসিয়া তাহার স্ত্রীকে সকল কথা বলিল। দুই দিনের মধ্যে জমিদারের খাজনা দিতে না পারিলে অদৃষ্টে অপমান ত আছেই, তাহার পর কি হইবে, আল্লাই তাহা জানেন।—মতির কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী লছিমন বিবি বলিল, "তাই ত গো, আমি যে কিছুই ঠাহর ক'রে উঠ্‌তে পারচি নে! পাঁঠাটা বেচে ফেল্‌লে খাজনা শোধ হয় তা বুঝি, কিন্তু ছেলেটা যে, কেঁদে খুন হবে! পাঁঠাটাকে সে এক লহমা চোখের আড় করতে চায় না। ওর উপর তার দরদ কত! মা দুগ্গির কাছে ওটাকে জবাই করবে শুনলে কি বাছা আমার বাঁচবে! কেমন ক'রে ওটাকে বেচে ফেলা যায় বল দিকিন্‌?"

দুইজনে অনেক পরামর্শের পর স্থির করিল, পাঁঠাটা চাটুয্যে মশাইকে দেওয়াই কর্ত্তব্য। তবে তাঁকে বল্‌তে হবে, যে দিন তাঁদের দরকার সেই দিনই পাঁঠাটা দিয়ে আসা হবে, তার আগে নয়।—মতি অপরাহ্ণকালে চাটুয্যে বাড়ী গিয়া কর্ত্তাকে এ কথা জানাইল। চাটুয্যে মহাশয় খুসী হইয়া বলিলেন, "বেশ, তাই হবে। আমি সপ্তমী পূজার দিন প্রথম বলি ঐ পাঁঠাটী দিয়েই দেব মনে করেছি। সেই দিন সাতটার মধ্যে পাঁঠাটী এনে দিস্‌, ন'টার মধ্যেই সপ্তমী

পূজা শেষ হ'য়ে যাবে। যেন দেরা করে ফেলিস্ নে, বুঝেচিস্। তা এখন ওটার দাম কত দিতে হবে বল্।"

মতি বলিল, "কর্ত্তা মশাই, আমরা আপনার খেয়েই মানুষ; আমি কি আর আপনার কাছে ওর দাম চাইতে পারি? না দাম নেওয়াই যায়? তবে কি করবো কর্ত্তা মশাই, জমিদারের খাজনা বাকি আছে, খাজনার জন্যে কাছারীর পাইক রোজ হাঁটাহাঁটি করছে, খাজনা দিতে পারছিনে; বড়ই মুস্কিলে পড়েছি।"

কর্ত্তা বলিলেন, "কত খাজনা বাকী আছে।"

মতি বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, এই তিন টাকা সাড়ে নয় আনা। সাড়ে তিন টাকা ত খাজনা ছিল; এখন আবার নায়েব মশাই ছয় পয়সা তহরী না পেলে খাজনা নেন না। কি কোরবো, গরীবের দেড় আনা বেশী নিয়ে যদি তাঁর কোঠা বালাখানা হয়, হোক্। গরীবের অনেক সয়।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তা হ'লে মতি, তোমার ঐ পাঁঠাটার দাম বলে তোমাকে চারিটি টাকাই দিই, কেমন? অন্য কোথাও বেচলে তুমি ওর দাম দু'টাকা ন'সিকের বেশী পেতে না। তা তুমি আমার পুষ্যির সামিল, তোমাকে কিছু বেশী দিলে তা আমার জলে পড়চে না।—আর তুমি এক কাজ কোরো, ষষ্ঠীর দিন এসে তোমার, তোমার ছেলের, আর

তোমার ছেলের মায়ের জন্য নূতন কাপড় নিয়ে যেও। এখনও পূজার কাপড় এসে পৌঁছেনি, বুঝলে।"

মতি বলিল, "কর্ত্তা মশাই, আপনারই ত খাচ্ছি, পাঁঠাটা ত আপনাকে অমনিই দিতে হয়। কি কোরবো, খাজনার দায়ে ঠেকেছি। আর যে অজন্মা কর্ত্তা, দিন গুজরাণ ভার হয়ে পড়েছে। মাথার উপর আল্লা আছেন, আর সুমুকে আপনি আছেন।"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে জন্য ভাবনা করিস্‌নে মতি। যে কয় দিন আমরা দুটো খেতে পাব, সে কয় দিন তুইও পাবি। যা, এখন এই চারটে টাকা নিয়ে যা। দেখিস্‌, যেন অন্য বাবদে টাকা কয়টা খরচ করে ফেলিস্ নে। আজই কাছারীতে গিয়ে খাজনাটা মিটিয়ে দিয়ে আসিস্। আর মনে থাকে যেন, সপ্তমীর দিন এই বেলা সাতটার সময় পাঁঠাটা হাজির করা চাই।"

মতি সম্মত হইয়া, কর্ত্তাকে সেলাম করিয়া টাকা লইয়া বাড়ী চলিল।

(৪)

সপ্তমীর দিন প্রাতঃকালে মতি তাহার স্ত্রীকে বলিল, "ওগো, তুমি একটা কাজ কর। ছেলেটাকে নূতন কাপড় পরিয়ে পাড়ায় নিয়ে যাও। তোমরা চ'লে গেলে আমি

পাঁঠাটা ঠাকুরবাড়ী দিয়ে আস্‌ব। আর এক কথা, ঠাকুর-বাড়ীতে যতক্ষণ খুব জোরে ঢাক বেজে না উঠ্‌বে, ততক্ষণ তোমরা বাড়ী ফিরো না ; বুঝেছ।"

মতির স্ত্রী স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়া ছেলেটাকে নূতন কাপড় পরাইয়া বেড়াইতে লইয়া গেল। যাইবার সময়ও মিয়াজান পাঁঠাটার গায়ে হাত বুলিয়ে ব'লে গেল, "মণিধন কোথাও যেও না। আমি নূতন কাপড় পরে ঠাকুর দেখ্‌তে যাচ্ছি ; এসে তোমাকে খুব ভাল ক'রে খেতে দেব, মণিধন।"

তাহারা যখন দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন মতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পাঠাটা লইয়া চলিল। সে কি যাইতে চায়! তার প্রতিপালক যে তাহাকে ঘরে থাকিতে বলিয়া গিয়াছে। পাঠাটা কিছুতেই যাইতে চাহে না। মতি অনেক টানাটানি করিয়া তাহাকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া চলিল। কি করিবে, উপায় নাই। পাঁঠাটা বাড়ীর দিকে চাহিয়া কাতর স্বরে চীৎকার করিতে করিতে চলিল। তাহার সকরুণ ব্যা ব্যা শব্দে বেদনা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। মতির দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

পূজা-বাড়ীতে তখন সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইয়াছে। আর একটু পরেই বলিদান হইবে। মিয়াজানের পাঁঠার

শোণিতই মা জগজ্জননী সকলের আগে পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবেন।

মতি পাঁঠা লইয়া পূজার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে মিত্রজা বলিলেন, "আরে মতি, এত দেরি ক'রে কি আস্‌তে হয়? আমরা যে এখনই লোক পাঠাচ্ছিলাম। মায়ের প্রথম বলি আগে থাকৃতেই ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হয়।"

মতি কোন কথা বলিল না। তাহার তখন কথা বলিবার মত অবস্থা ছিল না। তাহার বালক পুত্র মিয়া-জানের মলিন মুখ, সজল নয়ন, সে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল, তাহার ক্রন্দনধ্বনি তাহার কাণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

মতি পাঁঠার দড়ি ছাড়িয়া দিল। একজন ভৃত্য তাহাকে স্নান করাইতে লইয়া গেল। একটু পরেই পাঁঠাটাকে স্নান করাইয়া আনা হইল। তাহাকে প্রাঙ্গণের পার্শ্বে একটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইল। তখনও পূজা শেষ হয় নাই, বলির একটু বিলম্ব আছে।

যখন পূজা-বাড়ীতে জোরে বাজনা বাজিয়া উঠিল, তখন কোথা হইতে কেমন করিয়া মায়ের হাত ছাড়াইয়া, মিয়াজান পূজা-বাড়ীর বাজনা শুনিবার জন্য হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। মতি তখন বাড়ী

চলিয়া গিয়াছে। মিয়াজান আসিয়া প্রথমে তাহার 'মণি-ধন'কে দেখিতে পায় নাই; সে বাজনাই শুনিতেছিল। হঠাৎ একটা পাঁঠার আর্ত্তস্বর তাহার কাণে গেল। সে স্বর মিয়াজানের পরিচিত,সে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে পাইল, তাহারই মণিধন সিক্তদেহে, সিন্দূর-চর্চ্চিত হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। পাঁঠাটা মিয়াজানকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই স্বরই মিয়াজানের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। মিয়াজান এক লম্ফে তাহার মণিধনের নিকট যাইয়া তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইল। বিপৎকালে পক্ষীমাতা যেমন করিয়া তাহার বিপন্ন শাবকটীকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে, মিয়াজান তাহার মণিধনকে তেমনই করিয়া বুকে লইয়া বসিল।

চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিল। বলির ছাগ মুসলমানে স্পর্শ করিয়া ফেলিল! একজন ভৃত্য মিয়াজানকে মারিতে গেল। গোলমাল শুনিয়া চাটুয্যে মহাশয় সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, মিয়াজান পাঁঠাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। চাটুয্যে মহাশয়কে দেখিয়া মিয়াজান কাতর নয়নে তাঁহার দিকে চাহিল। বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এমন কাতর নয়ন, এমন মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টি কখন দেখেন

মায়ের বলি—১৪ পৃষ্ঠা।

BANI PRESS CALCUTTA.

নাই। চক্ষু ফিরাইতেই মণ্ডপস্থিতা, উজ্জ্বল-আভরণ-বিভূষিতা অসুর-স্কন্ধারূঢ়া মা দশভুজার মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; বৃদ্ধ দেখিলেন, মায়ের নয়নেও সেই স্নেহ-করুণ বেদনা-মাখা মিনতি-ভরা ভাব! তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন, তাহার পর ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "ওকে কিছু বলো না।"

তাহার পর বৃদ্ধ ধীরপদবিক্ষেপে, ব্যাকুল হৃদয়ে চণ্ডী-মণ্ডপে উঠিয়া গেলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা জগদম্বা, আজ এ কি দেখালি মা! এ তোর কি খেলা!" বৃদ্ধ আর কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

পূজার শেষে বলির বাজনা বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দে যেন তাঁহার মোহ ছুটিয়া গেল। তিনি ব্যগ্রভাবে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় আসিলেন এবং খড়গধারী মল্লবেশী কামারের দিকে চাহিয়া আদেশ করিলেন, "আজ হইতে আমার বাড়ীতে বলি বন্ধ।"

ঢাকের বাজনা বিস্ময়ে হঠাৎ থামিয়া গেল।

সিগারেট

এতদিনে আমার শিক্ষানবিশী শেষ হইল। আজ বার বৎসর—এক যুগ ধরিয়া বাবার নিকট শিক্ষানবিশী করিয়াছি। আমার বয়স যখন বার বৎসর, তখন বাবার পাঠশালায় ভর্ত্তি হই, আর আজ বার বৎসর পরে, আমার চব্বিশ বৎসর বয়সে, বাবা বলিলেন, "নলিন, আজ হইতে তুমি সাবালক হইলে। তোমার ইচ্ছে হয়, এখন তুমি রোজ দশ বাক্স সিগারেট উড়াইও; পাঁচ গণ্ডা চুরুট খাইও।" বাবার আফিসের বড় সাহেব—প্রধান অংশী সিন্‌ক্লেয়ার সাহেব—আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "নলি, তোমার বাবা আজ হইতে আমাদের এই ফারমের একজন অংশী হইলেন। আর তোমাকে আমাদের আফিসের হেড এসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত করা গেল। এখন তুমি মাসে দুই শত টাকা বেতন পাইবে; যোগ্যতার পরিচয় পাইলে আমরা ক্রমে তোমার বেতন বাড়াইয়া দিব।"

বাবা জন সিন্‌ক্লেয়ার কোম্পানীর হেড এসিষ্টাণ্ট ছিলেন, আজ সেই পদ আমি পাইলাম। তাই বাবা আমাকে আজ শিক্ষানবিশী হইতে অব্যাহতি দিলেন।

এ অব্যাহতির আরও একটা কারণ আজ ঘটিয়াছে ; গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে এম্-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে, আমি গণিত-শাস্ত্রে এম্-এ, পাশ করিয়াছি।

এতকাল পরে স্বাধীনতা দানের সময় আজ বাবা আমাকে যে কথাটি বলিলেন, তাহার অর্থ হয় ত—হয় ত কেন, নিশ্চয়ই—কেহ বুঝিতে পারেন নাই। বাবা বলিলেন, "এখন তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি রোজ সিগারেট্ উড়াইও।"—"বাবার এই কথার একটা ছোট—অন্যের নিকট ছোট হইলেও আমার নিকট প্রকাণ্ড—ইতিহাস আছে।

আমার বয়স যখন বার বৎসর তখন আমি হেয়ার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতাম। বাবা তখন এম্-এ পাশ করিয়া এই জন সিনক্লেয়ার কোম্পানীর আফিসে দেড় শত টাকা বেতনে চাকুরী করিতেন। এই কোম্পানীর সহিত আমাদের তিন পুরুষের সম্বন্ধ,—আমার পিতামহও এই আফিসে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করিতেন ; মৃত্যুকালে তিনি যথেষ্ট টাকা রাখিয়া যান। পিতামহের মনিব সাহেবদের অনুরোধে বাবা উকীল হইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া এই আফিসেই প্রবেশ করেন। ক্রমে তাঁহার বেতন পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল—অবশেষে তিনি এই ফারমের একজন অংশী হইলেন।

কিশোর

বাবা বড় চাকুরী করেন। পিতামহ বিস্তর নগদ টাকা ও দুইখানি বাড়ী রাখিয়া গিয়াছেন। সে সকলের একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি। আমিই পিতামাতার একমাত্র সন্তান, বাবার আর সন্তান হয় নাই। ঠাকুরমার আমিই একমাত্র পৌত্র, বাড়ীর আমিই একমাত্র 'খোকা বাবু।' সুতরাং আমার আদর-যত্ন, আমার আব্‌দার-অভিমান যে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, এ কথা কি আর বলিতে হইবে?

বড়মানুষের ছেলে, হেয়ার স্কুলে পড়ি, ঘরের গাড়ীতে স্কুলে যাই, বাড়ীর বেহারা রামভজন টিফিনের ছুটীর সময় জলখাবার লইয়া স্কুলে যায়, ঠাকুরমার কৃপায় টাকাটা, সিকিটা সর্ব্বদাই পকেটে থাকে; প্রতিদিন ভাল কাপড়, ভাল জামা, নূতন নূতন কোট পরিয়া স্কুলে যাই; আমার পকেটে ঘড়ি-চেন, এসেন্স-মাখানো রুমাল, মাথার চুলে সোজা সিঁথি কাটা; এই রকম যখন অবস্থা, তখন পড়াশুনা হউক,—না হউক, আমি বাবুগিরিতে যে বেশ পরিপক্ক হইয়াছিলাম তা বুঝিতেই পারিতেছ। স্কুলে আমার মত ছেলে আরও দশ বিশজন ছিল, তাহারা মাসে মাসে বেতন দিত, আর বেঞ্চের শোভা বর্দ্ধন করিত। আমিও সেই দলে মিশিয়াছিলাম। বয়স বার বৎসর হইলে কি হয়, তখনই আমাদের পরকাল ঝরঝরে হইয়াছিল।

সিগারেট

সকল বড় মানুষে ছেলের জন্য যাহা করেন, আমার বাবাও আমার জন্য তাহাই করিয়াছিলেন ; সকালে বাঙ্গলা পড়াইবার জন্য একজন পণ্ডিত রাখিয়া দিয়াছিলেন, বেতন দশ টাকা ; সন্ধ্যার সময় ইংরাজী পড়াইবার জন্য একজন বি-এ পাশ মাষ্টার রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শনী কুড়ি টাকা। নীচের ক্লাসের একটা ছেলের পড়ার জন্য একজন মাষ্টার, একজন পণ্ডিত, সুসজ্জিত পড়ার ঘর, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একজন খানসামা,—আর কি চাই ? পিতামাতা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোঝেন, আর দশজন পিতামাতা যাহা করিয়া থাকেন, আমার পিতামাতাও তাহাই করিয়াছিলেন।

আমার সঙ্গীদের সকলেরই বয়স আমার অপেক্ষা অধিক ; তাহাদের মধ্যে কেহ ফোর্থ ক্লাসে তিন বৎসর আছে, কেহ আমার সঙ্গেই পড়ে, কেহ বা উপরের ক্লাসে পড়ে। বেলা একটার পর যখন জলখাবারের ছুটী হইত, তখন তাহারা জল খাইত, সঙ্গে সঙ্গে পান-সিগারেটও চলিত। প্রথম প্রথম কয়েকদিন আমি সিগারেট খাই নাই ; তাহাদের শত অনুরোধেও আমি তাহাতে রাজী হই নাই। শেষে একদিন তাহারা জোর করিয়া আমাকে সিগারেট খাওয়াইয়াছিল। আমি সে দিন সিগারেটে একটা টান দেওয়ামাত্রই আমার মাথার মধ্যে যেন কেমন করিয়া

উঠিল; আমি সিগারেটটা ফেলিয়া দিলাম, সমস্ত অপরাহ্নটাই আমার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিতে লাগিল।

আমার যিনি ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন, তিনি সন্ধ্যার পর আমাকে পড়াইতে আসিতেন। আমাদের বাড়ীতে তামাক বা চুরুটের চলন ছিল না—বাবা ও রসে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু আমার 'সার'টী তামাকের বড়ই ভক্ত ছিলেন; আমাদের বাড়ীতে ধূমপানের সুবিধা নাই দেখিয়া তিনি সিগারেট ও দেয়াসলাই পকেটে করিয়া আমাকে পড়াইতে আসিতেন, এবং যে দেড় ঘণ্টা আমাকে পড়াইতেন, তাহার মধ্যে চারি পাঁচটা সিগারেট ভস্মসাৎ করিতেন।

যে দিন আমি প্রথম সিগারেটে টান দিয়া এই রকম অস্বস্তি বোধ করি, সেই দিন আমার 'সার' পড়াইতে আসিয়া সিগারেট ধরাইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সার, সিগারেট খেলে আপনার মাথা ঘোরে না ?" সার বলিলেন, "মাথা ঘুরবে কেন ? দশ বিশটা খেলেও কিছু হয় না।" আমি বলিলাম, "সিগারেট খাওয়ায় লাভ কি ?"

সার বলিলেন "পরিশ্রমের পর একটা সিগারেট টানলে শ্রম দূর হয়, বেশ একটু আরাম পাওয়া যায়।" আমি বলিলাম, "আপনি কতদিন থেকে সিগারেট খাচ্চেন ?" তিনি বলিলেন, "আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন ত সিগারেট

পাওয়া যেত না; আমরা তখন তামাক খাইতাম। আমার বয়স যখন দশ কি এগার বৎসর, তখন থেকেই তামাক ধরি। এখনও তামাকই বেশী খাই। তবে তোমাদের বাড়ীতে ত তামাকের কোন বন্দোবস্ত নেই, তাই সিগারেট নিয়ে আসি।”

সে দিন এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। মাষ্টার মহাশয়ের কথা হইতে এই সার সংগ্রহ করিলাম যে, তিনি যখন দশ এগার বৎসর বয়সে তামাক ধরিয়াছিলেন, তখন এ বয়সে আমিও সিগারেট খাইতে আরম্ভ করিলে দোষ কি? আর তিনি যে এত সিগারেট খান, তাতেও ত তাঁর মাথা ঘোরে না, বরঞ্চ শ্রম দূর হয়; তাহা হইলে আমিও দুই একদিন অভ্যাস করিলে আর আমার মাথা ঘুরিবে না। পড়িতে পড়িতে বা খেলা করিয়া আসিয়া যখন খুব পরিশ্রম বোধ হইবে, তখন দুই একটা সিগারেট টানিলে শ্রম দূর হইবে, এ কথা ত ‘সার’ই বলিলেন। তবে আর কি? কত ছেলে সিগারেট খায়, আমিও অভ্যাস করিব।

তাহার পর হইতেই ধীরে ধীরে সিগারেট টানিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু আমার মাথাটাই যেন কেমন, সিগারেটে দুই একটা টান দিলেই আমার মাথার মধ্যে

ঘুরপাক খাইয়া উঠে। তবুও কিন্তু হাল ছাড়ি নাই। সকলেই খায়, আর আমি পারিব না ?

পড়িবার ঘরে আমার একটা ডেস্ক ছিল ; তাহার তালা চাবী ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। তাহার মধ্যে আমার বই থাকিত। ক্রমে দুই এক বাক্স সিগারেটও সেই ডেস্কে স্থান পাইতে লাগিল।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি আমার পড়ার ঘরে বসিয়া কি করিতেছি, এমন সময়ে বাবা সেই ঘরে আসিলেন। বাবা কখনও আমার পড়ার ঘরে আসিতেন না, বা কোন দিন আমার পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন না ; মাষ্টার পণ্ডিতের উপর সে ভার দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। সে দিন হঠাৎ আমার পড়ার ঘরে আসিয়া বাবা বলিলেন, "নলিন, তোমার ডিক্সনারিখানা কোথায় ?" আমি বলিলাম, ডেস্কে আছে, দিচ্ছি।" তিনি বলিলেন, "না তোমাকে আর উঠ্‌তে হবে না, আমিই নিচ্ছি।" এই বলিয়াই তিনি ডেস্কের নিকট গেলেন। এ দিকে ভয়ে আমার মুখ শুকাইয়া গেল, ডেস্ক খুলিলেই যে তিনি সিগারেটের বাক্স দেখিতে পাইবেন! এখন উপায় ? আর উপায় !—এবার সিগারেটে টান না দিয়াই আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

বাবা ডেস্ক খুলিয়াই সম্মুখে সিগারেটের বাক্স দেখিলেন।

তিনি সে বাক্স সরাইয়া রাখিয়া ডিক্সনারি বাহির করিলেন, এবং বইখানি লইয়া আমার দিকে না চাহিয়াই সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন, আমাকে একটি কথাও বলিলেন না। সে সময় তাঁহার মুখের ভাব কেমন হইয়াছিল, তাহাও আমি সাহস করিয়া দেখিতে পারি নাই।

বাবা চলিয়া গেলেও আমার ভয় দূর হইল না। আমার মনে হইতে লাগিল, হয় ত তখনই তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন এবং তাহার পর যে অদৃষ্টে কি আছে, তাহা ভাবিয়াই আমি আকুল হইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বাবা সে দিন আমাকে কিছুই বলিলেন না,—একটা কথাও না। আমার কিন্তু সারা রাত্রিই ঐ কথা মনে হইতে লাগিল,—বাবা আমাকে কিছুই বলিলেন না কেন? এই কথাটা আমি যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমার মন কেমন করিতে লাগিল। শুধুই মনে হইতে লাগিল, আমার ডেক্সে সিগারেট দেখিয়া বাবা হয় ত মনে কত ব্যথা পাইয়াছেন। তিনি আমাকে বকিয়া কতকগুলো গালাগালি করিলেও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম, কিন্তু বাবা আমাকে যে কিছুই বলিলেন না! এমন ভাব আর কখনও আমার মনে স্থান পায় নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমি ডেক্স হইতে সিগারেটের বাক্স কয়টি বাহির করিয়া জানালা

দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলাম, মনে মনে স্থির করিলাম আর কখনও সিগারেট খাইব না।

পর দিন সন্ধ্যার সময় আমাদের চাকর হরি আসিয়া আমার হাতে তিন প্যাকেট খুব ভাল সিগারেট দিয়া বলিল, "দাদা বাবু, বাবু আপনার জন্য এই কয় বাক্স সিগারেট দিলেন।" হরির কথা শুনিয়া আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। হরি ইহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া বোধ হয় বাবাকে খবর দিয়াছিল ; কারণ তৎক্ষণাৎ বাবা আমার নিকটে আসিয়া আমাকে তাঁহার কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, "নলিন, কাঁদছ কেন ?" আমি তখন কথা বলিতে পারিলাম না। তিনি আমার হাত ধরিয়া বাহিরের বারান্দায় লইয়া গেলেন। সেখানে একখানি চেয়ারে বসিয়া তিনি আমাকে কোলে লইলেন। আমার কান্না একটু থামিলেই তিনি বলিলেন, "নলিন, তুমি কাঁদলে কেন ?" এমন মিষ্ট, এমন স্নেহপূর্ণ কথা আমি কোন দিন শুনি নাই। আমি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "বাবা, আমি আর কখনও সিগারেট খাবো না। আপনি সে দিন আমার ডেস্কে যে সিগারেটের বাক্স রেখেছিলেন, তা আমি সব ফেলে দিয়েছি, আর আমি কখনও সিগারেট খাবো না।" বাবা বলিলেন, "কেন

সিগারেট—২৫ পৃষ্ঠা
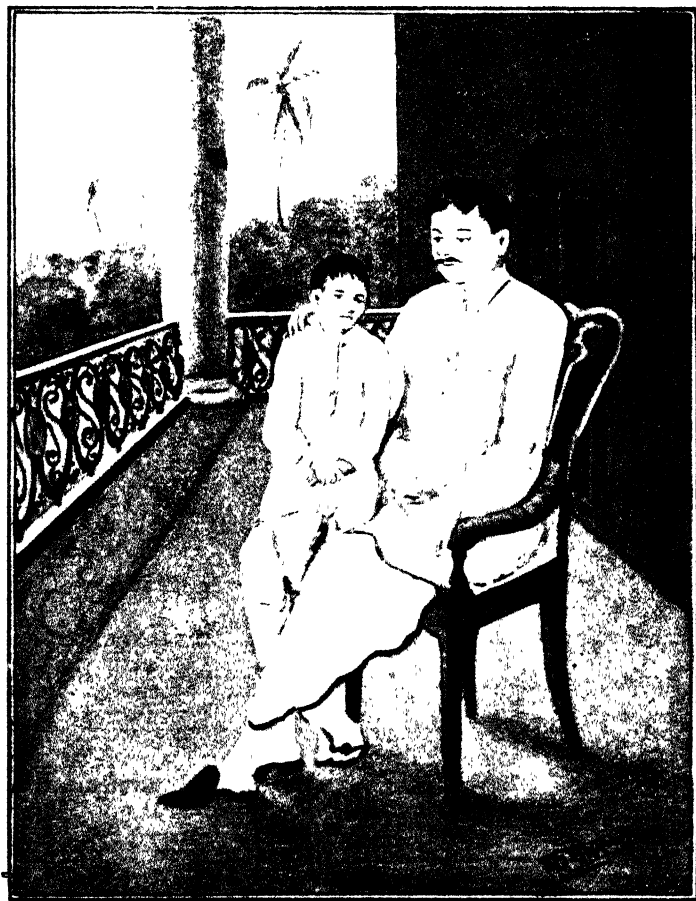
খাবে না, বাবা !" আমি বলিলাম, "আপনি সে দিন আমাকে কিছুই ব'ল্‌লেন না, তাইতে আমার মনে হোলো আপনি মনে বড়ই ব্যথা পেয়েছেন। তাই আমি ওসব ফেলে দিয়েছি, সিগারেটের উপর আমার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে, আর খাবো না।" বাবা বলিলেন, "আজ কাঁদ্‌লে কেন ?" আমি বলিলাম, "আজ আপনি আমাকে সিগারেট পাঠিয়ে দিয়েছেন তাই দেখে ! বাবা, এমন কাজ আমি আর কখনও কর্‌ব না।"

বাবার মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ; তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,"এ শিক্ষা তোমায় কে দিল ?' আমি তখন আমার প্রথম দিনের সিগারেট খাওয়ার কথা, মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহার পর আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, সমস্ত কথাই বাবাকে বলিলাম, কোন কথা গোপন করিলাম না। বাবা ধীর ভাবে বলিলেন, "তোমার মাষ্টার ত তোমাকে সিগারেট খেতে বলেন নাই; তাঁর নিজের কথা বলেছিলেন। যাক্‌, কা'ল থেকে আর তোমাকে কোন মাষ্টারের কাছে প'ড়তে হবেনা ; আমিই তোমাকে দু'বেলা পড়াব। কা'ল থেকে আমি তোমার সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব। যাও, তোমার মাষ্টার এসেছেন, পড় গে।"

তাহার পরদিনই বাবা কোন কথা না বলিয়া মাষ্টার ও পণ্ডিতকে বিদায় করিয়া দিলেন। আমাকেও হেয়ার স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া আর একটা ছোট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমাকে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন; একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া জল খাইয়া তাঁহার নিকট পড়িতে বসিতাম। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত তিনি আমাকে পড়াইতেন। পূর্ব্বে প্রাতঃকালে তিনি আফিসের কাজকর্ম্ম করিতেন, এখন তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহার সঙ্গে আহার করিয়া তাঁহারই সঙ্গে এক গাড়িতে উঠিতাম; তিনি আমাকে স্কুলে নামাইয়া দিয়া আফিসে যাইতেন। স্কুলের ছুটি হইলে আমি বাড়ী আসিতাম না, গাড়িতে আবার আফিসে যাইতাম। বাবা আমার জন্য নানারকম ছবির বই, ভাল বাঙ্গালা বই, আফিসে রাখিয়া দিতেন। আমি তাহাই দেখিতাম, পড়িতাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আফিসেই খাবার খাইয়া বাবার সঙ্গে বাহির হইতাম; তিনি আমাকে কত স্থান দেখাইতেন, সরকারী বাগানে লইয়া যাইয়া কত গাছ দেখাইতেন, তাহাদের কথা বুঝাইতেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আসিয়া একটু বিশ্রামের পর বাবা আমাকে লইয়া বসিতেন। পড়া হইত, হাসি গল্প হইত, খেলা হইত। বাবা একেবারে আমার সঙ্গী হইয়া

গিয়াছিলেন। আমি যে বাবার কাছে কত কথা শিখিতাম তাহা বলা যায় না। বাবা সন্ধ্যার পর বন্ধু বান্ধব লইয়া গান বাজনা, খেলা প্রভৃতি করিতেন; কিন্তু আমার পড়ার ভার লইয়া তিনি সে সব ছাড়িয়া দিলেন। একদিন একটী বন্ধু বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি গানবাজনা, আমোদ-আহ্লাদ ছাড়িয়া দিলেন কেন? তাহাতে বাবা উত্তর দিয়াছিলেন, "ও সকল কর্বার সময় পরেও পাব, কিন্তু ছেলে মানুষ করবার সুযোগ পরে আর পাব না। আমার ছেলে আমি যেমন পড়াইব, মাইনের মাষ্টারে কি তাই পারে?" তিনি আমাকেই গান শিখাইতেন, আমারই সঙ্গে তাস খেলা করিতেন! তিনি একেবারে আমাময় হইয়া গিয়াছিলেন। আমাকে মানুষ-করা ব্যতীত যেন এ জগতে তাঁহার আর কোন কাজ ছিল না।

যথাসময়ে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম; কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম। বাবাই আমার শিক্ষক রহিলেন। গণিতে এম্-এ পরীক্ষা যে দিলাম, তাহারও শিক্ষক বাবা। বাবা আমার জন্য যে পরিশ্রম করিতেন তাহা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। বাবা ইংরাজি সাহিত্যে এম্-এ পাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু গণিতের দিকে আমার ঝোঁক দেখিয়া তিনি আমাকে গণিত পাঠেই উৎসাহ দিতে

লাগিলেন এবং আমাকে পড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হইতে গত পাঁচ বৎসর আমাকে যথারীতি বাবার আফিসেও যাইতে হইত; তবে এ পাঁচ বৎসর আফিসে যাইয়া আর আমি পড়া-শুনা করিতাম না; আফিসের কাজ শিখিতাম। বাবা প্রথম প্রথম আমাকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কাজ শিখিবার জন্য সেই সেই বিভাগে বসাইয়া দিতেন। তাহার পর এই এক বৎসর তিনি আমাকে তাঁহার সহকারী করিয়া লইয়াছিলেন। কলেজের ছুটী হইলেই আমি আফিসে যাইতাম; তাহার পর যতক্ষণ বাবার কাজ শেষ না হইত ততক্ষণ আফিসের কাজ করিতাম। আফিসের বড় সাহেবও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

তাই এম্‌-এ পাশের খবর বাহির হইলে বড় সাহেব আমাকে হেড এসিষ্টাণ্ট করিলেন। আর বাবা সেই বার বৎসর পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া আমাকে প্রতিদিন দশ বাক্স সিগারেট খাইবার পূরা স্বাধীনতা দিলেন। আমি কিন্তু স্বাধীন হইয়াও কোন দিন সিগারেট স্পর্শও করি নাই। আমি আজ ভাবিতেছি আমার এই সৌভাগ্যের জন্য কাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব—বাবা, না সিগারেট!

বিধবার সন্তান

চুরি করিলে থানায় ধরিয়া লইয়া যায়, কাছারীতে বিচার হয়। যাহারা প্রথম চুরি করিয়াছে তাহাদের বেত্রাঘাত দণ্ড হয়, অপরের অর্থাৎ পাকা চোরদিগের কারাদণ্ড হয়। বালকেরা চুরি করিলে তাহাদিগকে সংশোধনী কারাগারে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ইহাই চুরির শাস্তি। কিন্তু আমি এক চোরের কথা জানি; সে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। তোমরা মনে করিয়া লও যে, আমিই যেন সেই চোর। আমি সেই প্রথম ও সেই শেষ চুরি করিতে যাইয়া যে দণ্ড ভোগ করিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ তোমাদিগের নিকট বর্ণনা করিতেছি।

তখন আমি ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ বলিলাম বলিয়া মনে করিও না যে, আমি তখন মায়ের কোলে ছিলাম। তাহা নহে; আমার বয়স তখন বারো কি তেরো বৎসর। এখন দেখি বারো তেরো বৎসরের ছেলে মস্ত জ্যাঠা হইয়া উঠে। তাহারা জলখাবারের পয়সা দিয়া সিগারেট কিনিয়া

খায়, তাহারা মুখে চোখে কথা বলে, তাহারা দুনিয়ার সমস্ত খবরই রাখে; অর্থাৎ এখনকার বারো তেরো বৎসর বয়সের ছেলে মানুষের মত হইয়া থাকে—ছেলেমানুষ থাকে না। কিন্তু ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এমন ছিল না। তখন ছেলের বয়স যতই বেশী হউক না কেন, তাহারা যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, এখনকার মত চালাক চতুর হইত না। বিশেষ আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমরা তখন লালপাগড়ী দেখিলে ভয়ে রান্নাঘরে মায়ের অঞ্চলের নীচে লুকাইতাম; সাহেব দেখিলে আমাদের মুখ শুকাইয়া যাইত, বাক্‌শক্তি লোপ পাইত। গুরুজনের সম্মুখে কথা বলিতে হইলে আমাদিগকে দশ বার 'থতমত খাইতে' হইত। তাই বঙ্কিম বাবু বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন "এখনকার দিনে যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পিচ্ ঝাড়ে।"—তবে আমাদের মধ্যেও তখন পাড়াগেঁয়ে রকমের দুষ্টামি ছিল।

আমি এই রকম পাড়াগেঁয়ে ছেলে। গ্রামের স্কুলে পড়িতাম। ছুটীর পর সকল ছেলে যখন হাডুডুডু খেলিত বা ঘুড়ি উড়াইত আমি তখন বসিয়া বসিয়া দেখিতাম। খেলায় যোগ দিতে আমার সাহসে কুলাইত না। এখন আমার পাঁচ বৎসর বয়সের ছেলে ফুটবলে যে ঠোক্কর মারে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই।

এখন যেমন গ্রীষ্মকালে বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া থাকে, তখন তেমন ছিল না। তখন পূজার পরেই পরীক্ষা হইত। একবার পরীক্ষার সময় আমরা এক ক্লাসের কয়েকটি ছাত্র স্থির করিলাম যে, আমরা পরীক্ষার পূর্ব্বে কয়েক রাত্রি একসঙ্গে থাকিয়া পড়িব। আমাদের পাড়ার এক সহপাঠীর বাড়ীতে পড়ার স্থান হইল। আমাকে তাহারা দলে লইতে চাহে নাই, কারণ আমি তাহাদের সঙ্গে বড় মিশিতাম না। কিন্তু অনেক সহি সুপারিস করিয়া আমিও তাহাদের দলভুক্ত হইলাম।

রাত্রিতে পড়িবার আয়োজন খুবই হইত; কিন্তু পড়া হইত না। পাঁচজন ছেলে এক সঙ্গে হইলে যাহা হয় তাহাই হইত;—শুধু গল্প, আর গল্প। তাহার পর যে যেখানে পাইত শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিত। পড়া-শুনার নামগন্ধও ছিল না।

দুই রাত্রি এই ভাবেই গেল। তৃতীয় রাত্রিতে আমি স্থির করিয়াছিলাম, আর পড়িতে যাইব না। পড়া হয় না, শুধু সময় নষ্ট হয়। সঙ্গীদিগকে এই কথা বলায় তাহারা রাগ করিল, কেহ ঠাট্টা করিল, বলিল, "ভারি গুড্ বয় হয়েছিস্!"—কি করি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের দলে মিশিতে হইল।

সে রাত্রিও পড়াশুনা তেমনই হইল। গল্প চলিতে লাগিল। রাত্রি দশটার সময় একজন প্রস্তাব করিল, সেই পাড়ার তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একটা খেজুর গাছ 'কাটা' হইয়াছে, সেই গাছ হইতে রস চুরি করিতে হইবে। সকলেই মহা উৎসাহে এই প্রস্তাবে রাজী হইল। আমি বলিলাম, "তোমরা যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না।" আমার কথা শুনিয়া তাহারা ভারি চটিয়া গেল। এক জন বলিল, "তুই যে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে উঠেছিস্ রে!"—আর একজন বলিল, "আমাদের এ দুর্য্যোধনের দলে যুধিষ্ঠিরের জায়গা নেই, দাও একে তাড়িয়ে।" সেই রাত্রে সত্যই যদি তাহারা আমাকে তাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে অন্ধকারে বাড়ী যাইতে পারিব না, ইহা বুঝিয়া আমি নরম স্বরে বলিলাম, "আমি ত তোমাদের যেতে বারণ করছি না। তোমরা যাও, আমি একেলাই এখানে থাকি।" কিন্তু তাহারা আমার সে কথায় কান দিল না। কেহ রাগ করিল, কেহ কেহ লোভ দেখাইয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিল। রাত্রিকালের 'জিরেন কাটা' খেজুর রস কেমন মিষ্টি, কেমন সুতার, সকাল বেলা খেজুর রসের সে স্বাদ থাকে না। আর ভয়ই বা কি? বামুনবাড়ীর সকলে এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কেহই চুরি ধরিতে পারিবে না। এই রকম কথাবার্ত্তার পর,

কুসংসর্গে যে ফল হয়, তাহাই হইল,—আমি তাহাদের সঙ্গে যাইতে রাজী হইলাম। তবে তাহাদের সঙ্গে আমার এই বন্দোবস্ত হইল যে, আমি বাগানের মধ্যে যাইব না, বাগানের পার্শ্বে রাস্তায় দাঁড়াইয়া পাহারা দিব, কেহ আসিতেছে কি না দেখিব। অন্যান্য সঙ্গীরা বাগানের ভিতর প্রবেশ করিবে, কেহ কেহ গাছে চড়িয়া খেজুর রস সংগ্রহ করিবে।—তাহারা অগত্যা এই বন্দোবস্তেই সম্মত হইল।

তখন আমরা ছয় জনে দল বাঁধিয়া রস চুরি করিতে চলিলাম। পূর্ব্বের ব্যবস্থা মত আমি রাস্তার উপরে বাগানের বেড়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। লতার বেড়া; সঙ্গীরা সেই বেড়া ফাঁক করিয়া বাগানে প্রবেশ করিল এবং অন্ধকারে অদৃশ্য হইল; আমি সেই অন্ধকার রাত্রিতে বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। চুরি-বিদ্যায় এই আমার হাতে খড়ি।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে একটি লোক সেই সময় বাগানের ভিতর শৌচে বসিয়াছিল। আমার সঙ্গীরা যে গাছে রস চুরি করিতে গিয়াছিল, লোকটি সেই গাছেরই কয়েক হাত দূরে বসিয়াছিল। সুতরাং সে সেই অন্ধকারের মধ্যেই ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিল। লোকটা তখন সাড়া দিলে চোরেরা সকলেই পলায়ন করিত। কিন্তু সে বসিয়া বসিয়া আমার সঙ্গিগণের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, 'টু' শব্দটিও করিল না।

ক্রমে যখন একজন গাছে চড়িল, আর একজন গাছে চড়িবার আয়োজন করিতে লাগিল, ঠিক সেই সময় সেই লোকটি উঠিয়া নিঃশব্দে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিল, "কে রে, গাছের উপর ?" আর "কে রে !"—যেমন এই কথা শুনা, অমনই সঙ্গীরা বেড়-বাতাড় বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া দে দৌড়। যে যে দিক দিয়া পারিল পলায়ন করিল ; কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করিল না। আমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া লোকটার প্রশ্ন শুনিয়াছিলাম, আমি চেষ্টা করিলে সকলের আগেই পলাইতে পারিতাম ; কিন্তু বলিয়াছি চুরিবিদ্যায় সেই আমার হাতেখড়ি ; 'গাছের উপর কে রে ?' শুনিয়াই আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল ! আমি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম, আমার চলিবার শক্তি লোপ পাইল, মনে হইল পা' দু'খানিতে কে যেন দুই মণ লোহা বাঁধিয়া দিয়াছে। আমি পলাইতে পারিলাম না। সঙ্গীদের পলাইতে দেখিয়া লোকটা 'ধর্ ধর্' বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল। আমি তখনও বেড়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলাম। লোকটি আমার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কে রে ?' আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। লোকটা আমাকে ধরিয়া ফেলিল ; তখন দেখিলাম তিনিই গৃহস্বামী, তর্কালঙ্কার ঠাকুর ! কি লজ্জা ! ঠাকুর আমার নাম

বিধবার সন্তান—৩৫ পৃষ্ঠা

জিজ্ঞাসা করিলে আমি কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নাম বলিলাম। ঠাকুর আমার নাম শুনিয়াই অবাক্। বলিলেন, তু'ই এত রাত্রে এখানে, রস চুরি কর্ত্তে এসেছিস্ বুঝি? তোকে ত ভাল ছেলে ব'লেই জান্তাম। তোর এ বিদ্যা কতদিন থেকে হয়েছে?" আমি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। অসৎ সংসর্গে পড়িয়া এই প্রথম আমি দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা তিনি আমার কথাতেই বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "তোর কোন ভয় নাই। আজ আর আমি তোকে কিছু বল্‌ছিনে। কিন্তু খবরদার, ঐ সব বদ্ ছেলের সঙ্গে আর কখনও মিশিস্ না। আবার যদি তোকে এমন কাজ কর্‌তে দেখি, তা হ'লে আমি ত মা'রবই, তারপর তোর দাদাকেও ব'লে দেব। চল্, তোকে বাড়ী রেখে আসি। কাল সকালে আমাদের বাড়ী আসিস্, তোকে এক ঘটী রস দেবো। আর যেদিন তোর রস খাবার ইচ্ছা হবে আমাকে বলিস্, তোকে পেট ভরে' রস খাওয়াব।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া আমাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন।

এত রাত্রিতে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়া ছেড়ে এই রাত দুপুরে বাড়ী এলি যে? আমি মার কাছে কখনও কোন কথা লুকাই নাই; তাঁকে সব কথাই

বলিলাম। একটা অন্যায় কাজ করিয়াছি, আবার মায়ের কাছে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার পাপের ভার বৃদ্ধি করিতে পারিলাম না। মা আমাকে তাঁহার কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন, "ওদের সঙ্গে আর মিশিস্ নে বাবা! তুই যে বিধবার সন্তান; তোর মুখ পানে চেয়েই এত কষ্ট সহ্য করেছি। তুই যদি কু-সংসর্গে মিশে ব'য়ে যাস্, তা হ'লে যে আমার আর দাঁড়াবার স্থান থাক্‌বে না বাবা।"—এই বলিয়া মা আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, আমার সমস্ত পাপ মাতৃ-হস্তের স্নেহস্পর্শে যেন মুছিয়া যাইতে লাগিল। মনে এতই কষ্ট হইল যে, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার চোখের জলে মায়ের অঞ্চল ভিজিয়া গেল। এমন কথা না বলিয়া মা আমাকে মারিলেন না কেন? মনে হইল দশ ঘা প্রহারে ইহা অপেক্ষা আমার লঘুদণ্ড হইত। সেই আমার প্রথম চুরির চেষ্টা, আর সেই আমার প্রথম শাস্তি; ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি আমি জীবনে কখনও ভোগ করি নাই। তাহার পর আমি কখন কোন অন্যায় কাজ করি নাই। মা কতদিন স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু যখনই সম্মুখে কোনও প্রলোভন আসিয়াছে, তখনই কি জানি কেমন করিয়া মায়ের করুণ কণ্ঠের বেদনা-ভরা কথাটি মনে হইয়াছে, "তুই যে বিধবার সন্তান!"

বার হাত শশার তের হাত বীচি

একদিন একখানি মাসিক পত্র পড়িতেছিলাম। পত্রখানির নাম প্রকাশের আবশ্যক নাই। প্রথমে একটি ছোট গল্প পড়িলাম, গল্পটি বেশ লাগিল; তাহার পরই একটা ছোট কবিতা। কবিতাটি ছোট হইলেও দমে ভারি। কবিতাটি দেখিয়া আমার রেল কোম্পানীর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কথা মনে হইল—দশ জনের স্থানে বাইশ জন আরোহীকে গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে; কেহ দাঁড়াইয়া আছে, কেহ কাহারও কোলের উপর বসিয়া আছে। কবিতাটিরও অবস্থা সেইরূপ। এতটুকু কবিতার মধ্যে মলয় পবন, চাঁদিনী যামিনী, কোকিলের কুহুস্বর, ভ্রমর গুঞ্জন, মাধবী বিতান ইত্যাদি বিরহের সমস্ত উপকরণই চৌদ্দটি ছত্রে সন্নিবিষ্ট। হা হুতাশ, দীর্ঘশ্বাসের ত অভাব নাই-ই। আরও দেখিলাম কবিতা-লেখক বিরহের বিষের জ্বালায় ছটফট করিতেছেন; তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড সাহারা মরুভূমি দেখিয়া আমার প্রাণ চমকাইয়া উঠিল; মনে হইল, বেচারী এমন সঙ্গীন বিরহ বুকে লইয়া জীবিত আছে কেমন করিয়া! কিন্তু কবিতাটি মোটের উপর আমার ভালই

লাগিল। আর যে কবি তাহার বিরহের বেদনা দশ জনকে বুঝাইবার জন্য এত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, তাহার উপর একটু সহানুভূতিরও উদ্রেক যে না হইল, এ কথা বলিতে পারি না।

একে উৎকট বিরহ—তাহার উপর কবিতা লিখিয়া পাঠকগণের প্রশংসা-লাভের চেষ্টা। একটু সহানুভূতি না পাইলে এই সকল কবি বাঁচে কিরূপে?

কবিতার নীচে যে নামটি দেখিলাম, তাহা আমার পরিচিত নহে। অনেক কাল ধরিয়া মাসিকপত্র পড়িতেছি; এ পর্য্যন্ত কোন দিন এই কবির নাম দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। এমন কবির হঠাৎ আবির্ভাবে আমি একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। ইচ্ছা হইল কবির একটু সন্ধান লই।

ইহার দুই তিন দিন পরে কোন কার্য্যোপলক্ষে উপরি-উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাকে ঐ কবিটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, লেখক তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত; তবে কবিতাটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহার কাগজে উহা ছাপাইয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম, "কবি যে কাপি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অবশ্যই তাঁহার ঠিকানা

আছে। এমন কবিকে কি হাত-ছাড়া করিতে আছে? কাপি বাহির করুন।" সম্পাদক মহাশয় আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে অনেক খুঁজিয়া কাপি বাহির করিলেন। তাহাতে কবির ঠিকানা লেখা ছিল। কবি পাড়াগেঁয়ে লোক নহেন, এই কলিকাতা সহরেই তিনি বাস করেন। আমি তাঁহার ঠিকানাটা লিখিয়া লইলাম। তাহার পর একদিন তাঁহার কবিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিলাম এবং যদি সুবিধা হয় তবে তাঁহার সহিত পরিচয়ের গৌরব অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, এ কথাও তাঁহাকে 'সবিনয় নিবেদন' করিলাম। পত্রের উত্তর আসিতে বিলম্ব হইল না, দুই দিন পরেই একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানির কাগজ-লেপাফা কবিজনোচিতই বটে। হাতের লেখা ঠিক কবিবর রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার মত। অতএব, আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, এত দিন পরে একজন কবির সহিত পরিচয়ের গৌরব অনুভব করা আমার অদৃষ্টলিপি। আমি মানস-নেত্রে দেখিলাম, সম্মুখের শনিবারে, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়, একটি সুঠাম, সুন্দর, গৌরবর্ণ যুবক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। তাঁহার কুঞ্চিত কেশদাম, দাড়ি-গোঁফ-কামান মুখমণ্ডল, সোণার চসমা, আপাদপতিত

দেশী চাদর, আদ্দির পাঞ্জাবী, আমি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

শনিবার আসিল। আমি অপরাহ্নকালে আমার আফিসে বসিয়া এই বিরহী কবির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে একটি বালক আমার আফিসে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে একখানি মিলের ধুতি, গায়ে একটা ছিটের জামা, চাদরের সম্পর্কও নাই। বাম হস্তে খান কয়েক বই ও খাতা এবং দক্ষিণ হস্তে একটি ছাতা। বালকটির বয়স ১৫ উত্তীর্ণ হইয়াছে কি না সন্দেহ!

বালকটি আমার নিকট আসিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলিল, "আমি আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কিছু প্রয়োজন আছে কি?" বালকটি তখন একখানি পোষ্ট কার্ড বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। ও হরি! এ যে কবিবরের নিকট লিখিত আমারই পোষ্ট কার্ড। আমি কি করিয়া বুঝিব যে এই ১৫ বৎসর বয়সের ছেলেটি সেই বিরহী কবি! আমি তাহাকে বলিলাম, "তবে কি—বাবু আজ আসিতে পারিলেন না?" বালক একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমারই নাম——।" আমি ত অবাক্! আমি তখন বালকটির মুখের দিকে

বাবু হাতে খাতার তের হাতে দিচি—৪২ পৃষ্ঠা।

BANI PRESS, CALCUTTA.

চাহিয়া রহিলাম ; কি বলিব স্থির করিতে পারিলাম না। একটু পরেই আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম, "আপনিই—কাগজে সেই সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছেন ?" বালক বলিল, "আজ্ঞে, সেটি আমারই লেখা।" আমি আর তখন কি করি ; বলিলাম, "বেশ, আপনার লেখা অতি সুন্দর হইয়াছে।" কিন্তু মনে হইতে লাগিল, ছেলেটার গণ্ডদেশে ঠাস্ করিয়া একটা চড় দিয়া তাহার দুধের দাঁত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিকট বিরহের শিকড় পর্য্যন্ত উপড়াইয়া দিই ! পনর বৎসর বয়সের ছেলে—এঁচড়ে পাকা নহে, একেবারে ফুল থেকেই আস্ত কাঁটাল ! কিন্তু কি করিব, ভদ্রতার অনুরোধে মনের ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি করেন ? বালক বলিল, "—স্কুলে পড়ি।" আমি বলিলাম, "এবারে কি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন ? বালক কবি বলিল, "আজ্ঞে না, আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি।" "এইবার বুঝি প্রমোসন পাইয়াছেন ?" বালক একটু লজ্জিত হইয়া বলিল "না, দুই বৎসর ঐ ক্লাসেই আছি।" তখন বালকটিকে বিদায় করিবার জন্য বলিলাম, "বোধ হয় স্কুল থেকেই এ দিকে আস্‌চেন। আপনাকে আর বিলম্ব করিতে বলিতে পারি না, মধ্যে মধ্যে সুবিধা পাইলে এ দিকে আস্‌বেন।"

বালকটি তখন বলিল, "আমি আরও কয়েকটা কবিতা লিখিয়াছি, আপনাকে দেখাব ব'লে খাতাখানি নিয়ে এসেছি। আমি বলিলাম, "আজ ত আমার সময় নাই; এখনই আমাকে বেরুতে হবে। আপনি আর এক দিন আস্‌বেন!" এই বলিয়াই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কবি তখন আর কি করে, আমাকে একটি নমস্কার করিয়া বিষণ্ণ বদনে প্রস্থান করিল।

আমার তখন ছেলেবেলাকার কথা মনে হইল। ছেলেবেলায় রাত্রিতে পিসিমার কাছে শুইয়া গল্প শুনিতাম। পিসিমা বলিতেন, কলির শেষে বেগুন গাছতলায় হাট ব'সবে, ন' বছরের মেয়ের সন্তান হবে, বার হাত শশার তের হাত বীচি হবে। আমার মনে সেই কথা জাগিতে লাগিল। বেগুনগাছ-তলায় হাট বসিতেছে কি না তাহা জানি না, তবে দশ বছরের মেয়ের সন্তান হইতেছে। আর বার হাত শশার তের হাত বীচি—তাহা ত আজ প্রত্যক্ষই দেখিলাম। বুঝিলাম কলির শেষ হইবার আর বিলম্ব নাই। পনর বৎসর বয়সের ছেলের যখন এমন উৎকট বিরহ আরম্ভ হইয়াছে, তখন বোধ হয় মহাপ্রলয় অতি নিকট।

পরিচয়

একদিন কোনও কাজের জন্য আমাকে নৈহাটী যাইতে হইয়াছিল। শিয়ালদহ হইতে নৈহাটীর একখানি মধ্য শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া গাড়ী ছাড়িবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আমি যে গাড়ীখানিতে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কেহই উঠিল না. আমি একেলা বসিয়া রহিলাম। গাড়ী ছাড়িবার একটু পূর্ব্বে সতর আঠারো বৎসর বয়সের একটি ছেলে আসিয়া, আমি যে গাড়ীতে বসিয়াছিলাম, সেই গাড়ীতে উঠিল। যাহা হউক কথা বলিবার একটা লোক মিলিল মনে করিয়া একটু আরাম বোধ করিলাম।

ছেলেটি গাড়ীতে উঠিয়া আমার সম্মুখের বেঞ্চেই উপবেশন করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, তুমি কোথায় যাবে ?"

অপরিচিত ভদ্রলোকের ছেলে. ভাল কাপড় চোপড় পরা, চক্ষুতে সোণার চসমা. দেখিলেই বোধ হয় সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, লেখাপড়াও জানা আছে। অথচ তাহাকে একেবারে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করাটা হয় ত কাহারও

নিকট অভদ্রতা বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু আমরা সেকেলে মানুষ, বয়স অনেক হইয়াছে; সতর বৎসরের একটি ছেলেকে—সে হয় ত আমার পৌত্রের বয়সী—'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতে আমার যেন একটু সঙ্কোচ বোধ হইল। তাই তাহাকে বলিলাম "বাবা, তুমি কোথায় যাবে?"

ছেলেটি বলিল "মুরশিদাবাদ।"

"সেখানে কি করা হয়?"

"আমার দাদা সেখানে মাস্টারি করেন, তাঁর কাছে যাচ্ছি।"

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম বঙ্কিমচন্দ্র রায়।"

"পিতার নাম?"

"হরমোহন রায়।"

"পিতামহের নাম?"

অন্য কোন ছেলে হইলে হয়ত এতক্ষণ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া এমন দশ কথা শুনাইয়া দিত যে, আমি পিতামহের নাম কেন, পিতার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতাম; কিন্তু এ ছেলেটি তেমন নয়। তবে আমার মত একটা অসভ্য সেকেলে বুড়ো তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের সংবাদ গ্রহণ

করিবার কি দাবী রাখে ইহা মনে করিয়া ছেলেটি যে একটু বিরক্ত হইয়াছিল, তাহা তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। ছেলেটি বলিল "আমার পিতামহের নাম কৃষ্ণমোহন রায়।"

"প্রপিতামহের নাম ?"

ছেলেটী এবার বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই বলিল, "জানিনে মশাই !"

ইচ্ছা ছিল ছেলেটির মাতামহ বংশেরও পরিচয় গ্রহণ করি ; কিন্তু তাহার বিরক্তির ভাব দেখিয়া ওদিকে আর অগ্রসর হইলাম না। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, তোমরা কি জাতি ?"

"আমরা ব্রাহ্মণ।"

"তোমার পিতাঠাকুর কি জীবিত ?"

"না, তিনি মারা গিয়াছেন, দাদা মশাই এ যাবত বেঁচে আছেন।"

"আহা, বাপ নেই ! তা বাবা, তুমি কি লেখাপড়া কর ?"

"আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এস্-সি, পড়ি।"

"বেশ, বেশ ! তোমরা কয় সহোদর ?"

"আমরা দুই ভাই, আমিই ছোট।" এই বলিয়া

ছেলেটি আমার প্রশ্নের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাহার হস্তস্থিত পুস্তকখানি খুলিয়া বসিল। আমি দেখিলাম বেগতিক। বুড়া মানুষ কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? হয় হুঁকা, নয় বাক্য, এই দুইটির একটি চাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হুঁকার প্রয়োজনাভাব—আমি তামাক খাই না। সুতরাং কথা বলা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওখানা কি বই?"

"পারিবারিক প্রবন্ধ।"

বইখানির নাম শুনিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল। কলেজের ছেলেরা যে ডিটেক্‌টিবের গল্প বা নাটক নবেল ফেলিয়া ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আমি জানিতাম না। আমি তখন ছেলেটিকে বলিলাম, "বেশ বাবা, ঐ ত তোমাদের পক্ষে পড়বার উপযুক্ত বই। ওখানা পড়া শেষ হইলে সামাজিক প্রবন্ধ বইখানাও পড়িয়া ফেলিও। শুধু পড়িলেই হবে না বাবা, ঐ মত কাজ করিতে চেষ্টা ক'রো। ছাই নাটক নবেল না প'ড়ে যদি এই সব বই তোমরা পড়, তা' হ'লে তোমাদের কল্যাণ হয়।"

ছেলেটি আমার কথা শুনিয়া বইখানি বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি বাজে বই পড়ি নে। কলেজের পড়া ঠিক

হয়ে গেলে যখন সময় পাই, তখন ভাল ইংরাজি বই, কি ভাল বাঙ্গালা বই পড়ি। নাটক নবেল আমার ভাল লাগে না। আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ প'ড়তে আমার খুব ভাল লাগে।"

আমি বলিলাম, "এই ত চাই। আমাদের দেশের ইতিহাস প'ড়বে, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ প'ড়বে, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের আলোচনা ক'রবে, দর্শন পাঠ ক'রবে, তবে ত মানুষ হবে। তারপর তোমরা ইংরাজী পড়ছ; বড় বড় ইংরাজ লেখকের বই প'ড়বে; তাঁদের দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা ক'রবে; তাঁদের সাহিত্য প'ড়বে। কিন্তু তাঁদেরও বাজে বই প'ড় না।"

ছেলেটি বলিল, "হাঁ, আমি তাই করি।" আমি তখন বলিলাম, "বাবা, যদি কিছু মনে না কর তবে দু'টো কথা বলি। দেখ্‌চ ত, আমি তোমার বাপের বয়সী। আমার কথাগুলা যদি ভাল ভাবে লও তবে বলি।"

ছেলেটি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আপনি ও কি বোল্‌ছেন। আপনারা কত দেখেছেন, কত জানেন। আপনাদের কাছে উপদেশ পাওয়া ত আমাদের সৌভাগ্যের কথা।"

আমি বলিলাম, "দেখ বাবা, তুমি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তোমার সঙ্গে প্রথম কথা ব'ল্‌তেই 'তুমি'

ব'লে সম্বোধন করেছিলাম। তোমার কাছে সেটা হয় ত ভাল বোধ হয় নাই!"

ছেলেটি বলিল, "না, আমার কিছুই মনে হয় নাই; বরঞ্চ আপনি যদি আমার সঙ্গে 'আপনি' ব'লে আলাপ ক'র্‌তেন তা হোলে যেন কেমন শুনাত।"

আমি বলিলাম, "ঠিক কথা, তারপর শোন। তোমাকে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে হ'য়েছিল। তার কারণ কি জান? তোমরা নিজের পরিচয় দিতে জান না। তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বলিলে বঙ্কিমচন্দ্র রায়'। এখন বল ত, আমি কি কোরে বুঝবো যে তুমি হিন্দু, না খৃষ্টান। হিন্দুর ছেলে নিজের নাম ব'ল্‌তে 'শ্রী' ব্যবহার করিয়া থাকে। তুমি এমন শ্রীমান্ ছেলে হ'য়ে 'শ্রী' হীন নাম ব্যবহার ক'র্‌লে কেন? এটা ভাল নয় বাবা। তারপর দেখ; তুমি কি জাত? এ কথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌তে হ'ল কেন জান? তোমার যখন নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তখন যদি তুমি ব'ল্‌তে যে, তোমার নাম শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ রায়, তা হ'লে ত আর ও প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিতে হইত না। তারপর আর এক কথা। তোমার পিতার নাম, পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তাঁদের নামের পূর্ব্বে না বলিলে "শ্রীযুক্ত", না বলিলে 'ঈশ্বর' বা 'স্বর্গীয়'।

সুতরাং তাঁরা কে বেঁচে আছেন, না আছেন, সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে হ'ল। দেখ, পরিচয় দিবার এই যে দস্তুরগুলি আমাদের দেশে বহুকাল থেকে প্রচলিত হ'য়েছে, সেগুলিকে তোমরা কি অপরাধে ছেড়ে দিতে গেলে ? তুমি হিন্দুর ছেলে, ব্রাহ্মণবংশে তোমার জন্ম, তুমি আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র প'ড়তে ভালবাস ; তার পর, তুমি উচ্চ-শিক্ষা লাভ ক'রছ। তোমরা যদি দেশের ভাল ভাব, ভাল আদব কায়দা ত্যাগ ক'রে ঐ এক রকম হ'য়ে যাও, তা হ'লে কি মনে দুঃখ হয় না ? এমন সুন্দর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেব শর্ম্মণঃ রায় ত্যাগ ক'রে তুমি যদি বল 'আমার নাম বি, রে'; তা হ'লে তোমাকে কি ব'লতে ইচ্ছা করে বল দেখি ? মনে কিছু ক'র না বাবা, দেশের যেগুলি ভাল তা কোন মতেই ত্যাগ ক'র না, আবার বিদেশের যেগুলি ভাল তা নিতেও কোন দিন দ্বিধা বোধ ক'র না। তোমাদেরই সব ভাল, অন্যের সবই মন্দ, এ কথাটা কোন দিন মনে স্থান দিও না। ভাল মন্দ সকল দেশেই আছে, সকল সমাজেই আছে। যদি ভাল হ'তে চাও, তা' হ'লে যাদের যা ভাল আছে, সব আত্মসাৎ ক'রবে। তাতে হিন্দু খৃষ্টান ভেদ ক'রো না। দেখ বাবা, আর একটি কথা তোমায় বলি। তুমি তোমার প্রপিতামহের নাম বলিতে পারিলে না। এটা কি

ভাল ? তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, প্রথম চার্লসের বংশ-পরিচয় বল, তাহা হইলে তুমি তিনশত বৎসরের নামের তালিকা অনায়াসে দিতে পারিবে ; কিন্তু তুমি তোমার প্রপিতামহের নাম জান না ! পৃথিবীতে আমার পক্ষে যদি কিছু গৌরবের কথা থাকে, যদি কিছু শ্লাঘার কথা থাকে, তবে তাহা আমার বংশ-পরিচয়। সেই বংশপরিচয় যদি আমার না থাকে, তবে—আমি কে ? আমি কোথাকার কে ? আমার অনুরোধ, বাবা, তৈমুর লঙ্গের প্রপিতামহের নাম জানিবার গভীর গবেষণা পরে করিও ; আগে নিজের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সম্পূর্ণ পরিচয় উদ্ধার কর। কে জানে, এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া হয় ত তুমি দেখিতে পাইবে যে, তুমি অমুক মহাপণ্ডিতের বংশধর। তখন তোমার মনে কত আনন্দ হইবে ; তখন সেই মহাপণ্ডিতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে তোমার বুক কতখানি ফুলিয়া উঠিবে। আর যখন সেই পরিচয় প্রদান করিয়া শ্লাঘা বোধ করিবে, তখন তাঁহার উপযুক্ত বংশধর হইবার জন্য চেষ্টা স্বতঃই তোমার হৃদয়ে জাগ্রত হইবে।”

এমন সময় বারাকপুর ষ্টেসনে গাড়ী থামিল। আর এক দল যাত্রী আমাদের গাড়ী আক্রমণ করিল। আমাদেরও কথা বন্ধ হইল। যথাসময়ে আমাদের গাড়ী নৈহাটী

পরিচয়—৫১ পৃষ্ঠা।

BANI PRESS, CALCUTTA.

ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। ছেলেটি তখন তাড়াতাড়ি নামিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার পরিচয় ত জানিতে পারিলাম না!"

আমি বলিলাম, "বাবা, তুমি ত আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর নাই। এখন ত আর পরিচয় দিবার সময় নাই, তুমি গাড়ীতে উঠিয়া ব'স। এখনই গাড়ী ছাড়িবে। আবার যদি কখন দেখা হয়, তাহা হইলে পরিচয় করা যাইবে। আমার নিরাকার নামটা তুমি মনে রাখিও। আমার নাম শ্রীজলধর দাস সেন।

“আরে অর্থাৎ”

আমাদের স্কুলের বুড়া হেড্ পণ্ডিত মহাশয় মরিয়া গেলে যিনি নূতন হেড্ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া আসিলেন, তাঁহার নাম শ্রীরমানাথ বিদ্যাভূষণ। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করিয়াছিলেন। নূতন পণ্ডিত মহাশয়ের বয়স বেশী নহে—বোধ হয়, ২৩।২৪ বৎসর হইবে। বয়স কম হইলেও তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন, পড়াইতেও খুব ভাল পারিতেন ; কিন্তু তাঁহার একটা মুদ্রাদোষ বড়ই প্রবল ছিল! তিনি একটা কথা বলিতে গেলে তাহার মধ্যে দশটা “আরে অর্থাৎ” বলিতেন। এই কথাটিই তাঁহার কাল হইয়াছিল।

প্রথম যেদিন তিনি আমাদের শ্রেণীতে পড়াইতে আসিলেন, সেদিন তাঁহার এই “আরে অর্থাৎ” শুনিয়া ক্লাশশুদ্ধ ছেলে হাসিয়া অস্থির হইয়াছিল। আমাদিগকে হাসিতে দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় বড়ই লজ্জিত হইলেন ; কিন্তু আমাদের হাসির কারণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, “তোমরা, আরে অর্থাৎ হাস কেন ? শিক্ষকের সহিত—আরে অর্থাৎ—এমন ব্যবহার করা—আরে অর্থাৎ—কি ভাল ?” ইহাতে হাসি থামিবে কেন, আরও বাড়িয়া

চলিল। কলিকাতা সহরের বড় স্কুল, আমরা উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, আমাদের অনেকের অবস্থাও ভাল। তিনি নূতন লোক, সেই দিন প্রথম কার্য্যে উপস্থিত হইয়াছেন—এ অবস্থায় আমাদিগকে তিরস্কার করিতে পারিলেন না। হেড্ মাষ্টারের নিকট যে অভিযোগ করিবেন, সে সাহসও তাঁহার হইল না; তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তোমরা—আরে অর্থাৎ—হাসিও না।" কিন্তু কাহার কথা কে শোনে? আমরা সেই একদিনেই "আরে অর্থাৎ" শিখিয়া ফেলিলাম এবং সেই দিনেই এই নূতন পণ্ডিত মহাশয়ের নাম হইল "আরে অর্থাৎ"।

শুধু আমাদের শ্রেণীতেই যে তাঁহাকে এইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা নহে; তিনি সেই প্রথম দিনে যে যে শ্রেণীতে গিয়াছিলেন, সকল স্থানেই এই প্রকার অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন, সকল শ্রেণীর ছাত্রেরাই তাঁহার "আরে অর্থাৎ" নাম-করণ করিয়াছিল। ছুটীর পরে তিনি যখন বাহিরে আসিলেন, তখন প্রায় সকল ছাত্রই তাঁহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল "এ আমাদের 'আরে অর্থাৎ'।"

আমাদের শ্রেণীতে প্রথম নম্বরের 'ফাজিল' বলিয়া আমি প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলাম। ফাজলামি ও

ইয়ারকিতে আমার সমকক্ষ কেহ আমাদের শ্রেণীতে ছিল না; সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের এই "আরে অর্থাৎ" নামটা আমার দ্বারাই বেশী জাহির হইয়াছিল।

পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী পল্লীগ্রামে। তিনি গোয়াবাগানের এক মেসে থাকিতেন। আমাদের বাড়ীও গোয়াবাগানে। পণ্ডিত মহাশয়কে এতদিন চিনিতাম না; সুতরাং তাঁহার "আরে অর্থাৎ" এর সংবাদও রাখিতাম না। যেদিন তিনি প্রথম আমাদের স্কুলে চাকুরী করিতে গেলেন, সেইদিনই তাঁহার সহিত পরিচয় না হইলেও "আরে অর্থাৎ" এর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়াই "আরে অর্থাৎ" কথাটা আমাদের পাড়ার ছেলে-মহলে রাষ্ট্র করিয়া দিলাম এবং দুই এক দিনের মধ্যে "আরে অর্থাৎ" পণ্ডিত মহাশয়কে সকলের পরিচিত করিয়া দিলাম। পাড়ার ছেলেরা পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিলেই চীৎকার করিয়া বলিত, "ঐ যে 'আরে অর্থাৎ' আস্‌ছেন।" কেহ কেহ "'আরে অর্থাৎ' নমস্কার মহাশয়" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেও ছাড়িত না।

পণ্ডিত মহাশয় অতি কষ্টে কোন প্রকারে সাত দিন পর্য্যন্ত আমাদের স্কুলের চাকুরী রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সাত দিনেই আমরা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলাম।

তাঁহার ক্লাশে আসিবার পূর্ব্বেই আমরা বোর্ডের উপর বড় বড় অক্ষরে "আরে অর্থাৎ" লিখিয়া রাখিতাম। তিনি ক্লাশে প্রবেশ করিলেই, চারিদিক হইতে ঐ কথাই তাঁহার কর্ণে পৌছিত। তাঁহার সহিত কথা বলিতে গেলেও, আমরা সেই কথার মধ্যে ৫।৭টা "আরে অর্থাৎ" ব্যবহার না করিয়া ছাড়িতাম না। সাত দিন পর্য্যন্ত পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগের ঠাট্টা তামাসা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। তাহার পরই তিনি আমাদের স্কুলের কার্য্য ত্যাগ করিলেন। যে দিন তিনি চলিয়া যাইবেন, সেই দিন আমাদের শ্রেণীতে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া ছল ছল চক্ষে অতি কাতর বচনে বলিলেন, "দেখ যতীন, আমি—আরে অর্থাৎ—কাল থেকে আর আস্‌ছিনে। ভিক্ষা করিয়া—আরে অর্থাৎ—খাব, তবুও—আরে অর্থাৎ—তোমাদের মত ছেলেদের শিক্ষকের কাজ করিব না।" অতি ধীরে ধীরে এই কয়েকটি কথা বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের এই কয়েকটি কথা শুনিয়া এবং তাঁহার ছল ছল চক্ষু ও তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া আমার তখন বড়ই কষ্ট বোধ হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, "আমাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এবং অপমান বোধ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় চাকুরী ত্যাগ করিয়া গেলেন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আমাদের ব্যবহার মনে করিয়া সেদিন সত্য সত্যই আমি একটু অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পরে আর সে কথা মনে ছিল না। পণ্ডিত মহাশয়কেও আর আমাদের পাড়ায় দেখিতে পাই নাই—বোধ হয় সেই দিনই তিনি বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, অথবা দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন।

ইহার দুই মাস পরে আমি একদিন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া বাড়ীর দিকে যাইতেছি, এমন সময়ে পথের মধ্যে দেখি —সেই পণ্ডিত মহাশয়। তাঁহার মলিন বসন, শুষ্ক বদন, উদাস দৃষ্টি দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, পণ্ডিত মহাশয় আর কোথাও চাকুরী জোটাইতে পারেন নাই। আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া "পণ্ডিত মহাশয়, নমস্কার" বলিতেই তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাপু, ভাল আছ ত?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে,—আমায় চিন্‌তে পেরেছেন কি?" তিনি একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "তোমায় কোথায় যেন—আরে অর্থাৎ—দেখেছি। কিন্তু ঠিক ঠাওর কর্ত্তে পার্‌ছি না।" আমি বলিলাম, "আমি যতীন। আপনি আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন।" পণ্ডিত মহাশয় তখন সহাস্যবদনে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, এখন চিন্‌তে পার্‌ছি—যতীন।" আমি বলিলাম, "পণ্ডিত মহাশয়,

এখন আপনি কি করিতেছেন ?” তিনি বলিলেন, “কিছুই করছিনে। যেখানেই—আরে অর্থাৎ—পণ্ডিতির চেষ্টা করি, সেইখানেই পূর্ব্ব চাকুরীর—আরে অর্থাৎ—কথা বল্তে গিয়ে তোমাদের স্কুলের কথা বলি। মিথ্যা কথাটা—আরে অর্থাৎ—বল্তে পারিনে। কেন তোমাদের স্কুলের—আরে অর্থাৎ—চাকুরীটা গেল, তাও কাজেই বল্তে হয় ; তাই কেউ আর আমায় নিযুক্ত কর্ত্তে চান না। এই দুই মাস—আরে অর্থাৎ—দেখলুম ; এখন মনে করেছি—আরে অর্থাৎ—দেশে গিয়ে—আরে অর্থাৎ—যা হয় কর্ব্বো। গরীব মানুষ, বসে থাক্‌লে—আরে অর্থাৎ—চলে না।” আমি বলিলাম, “আপনি বি, এ, পাশ করেছেন, কোন আফিসে চেষ্টা করুন না ?” পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “সে চেষ্টাও কি—আরে অর্থাৎ—করিনি, কিন্তু মুরুব্বী চাই।” পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড়ই কষ্ট হইল। তখন মনে হইল, আমরা যদি তাঁহার ‘আরে অর্থাৎ’টা সহিয়া যাইতাম, তাহা হইলে, তাঁহাকে এমন বিপন্ন হইতে হইত না। আমার মনে হইল যে, আমরাই তাঁহার এই কষ্টের কারণ। প্রথম চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে তিনি এমন দমিয়া গিয়াছিলেন। আমি তখন তাঁহার ঠিকানা জানিয়া লইয়া বাড়ীতে আসিলাম।

এই সময়ে আমার একজন গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমার যিনি শিক্ষক ছিলেন, তিনি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। আমার মনে হইল, পণ্ডিত মহাশয়ের এই 'আরে অর্থাৎ' নাম-করণ আমিই করিয়াছিলাম, আমিই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত করিয়াছিলাম—হয় ত আমারই জ্বালায় তিনি চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করিলে হয় না ?

সেই দিন বাড়ীতে যাইয়া আমি বাবাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র, আমাদের অবস্থাও ভাল। বাবা আমার কথা শুনিয়া আনন্দিত মনে বলিলেন, "বেশ ত! তিনি যখন ভাল লেখাপড়া জানেন, পণ্ডিত লোক, ভালমানুষ তখন তাঁহাকে রাখিতে আমার কিছুই আপত্তি নাই। বিশেষ তুমি যখন তোমার অন্যায় ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়েছ, তখন তাঁকে এইভাবে সাহায্য করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি কালই গিয়ে তাঁকে বোলো, তিনি তোমাকে সকালে দুই ঘণ্টা, সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা পড়িয়ে যাবেন, আমি তাঁকে ৬০৲ টাকা মাহিয়ানা, আর ট্রাম ভাড়া দিব।"

আমি পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় গেলাম এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। পণ্ডিত

আরে অপাই—৫৮ পৃষ্ঠা।

FANI PRESS, CALCUTTA.

মহাশয় কৃতজ্ঞতাভরে আমাকে তাঁহার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন—একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল আমার স্কন্ধের উপর পড়িল। আমার মনে হইল, সেই অশ্রুতে আমার ছাত্রজীবনের একটি কলঙ্ক-কালিমা ধৌত হইয়া গেল, আমার অপরাধের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

ট্রাম গাড়ী।

আমরা ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, এই কলিকাতা সহরে এত গাড়ী ঘোড়া ছিল না। মোটর গাড়ীর বা বাইসাইকেলের নামও আমরা জানিতাম না, ট্রাম গাড়ীর অস্তিত্বও আমরা কল্পনা করিতে পারিতাম না, এরোপ্লেন বা ঐ রকম কিছু তখন আমাদের কাছে রামায়ণ মহাভারতের গল্প ছিল। তখন এই সহরে খুব বড় মানুষদের ঘরের গাড়ী, পাল্‌কী ছিল; আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিত, অতি অল্প সংখ্যক ঘোড়ার গাড়ী। সে সকল ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়াও কম ছিল না; বিডন ষ্ট্রীটের কোম্পানীর বাগানের নিকট হইতে তেরজুরী (ট্রেজারি) বা বান হাউস (Bonded Ware-House) যাইতে হইলে একখানি ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া ছিল দেড় টাকা, সাত সিকে; বর্ষা বাদলের দিনে ঐ ভাড়া তিনগুণ—চারিগুণ চড়িয়া উঠিত। তাই সে সময়ে আফিসের বাবুরা পদব্রজেই কর্ম্মস্থানে যাতায়াত করিতেন।

এখন কিন্তু আর সে দিন নাই; এখন নয়টা পয়সা ফেলিলে বেলগেছিয়া হইতে কালীঘাট কি বেহালায় যাওয়া যায়; পাঁচটী পয়সায় চিৎপুর হইতে হাইকোর্টে যাওয়া যায়। তাই এখন পঁচিশ টাকা বেতনের কেরাণী বাবুও

অন্ততঃ পাঁচটী পয়সা খরচ করিয়া প্রথম বেলায় আফিসে যান। আমরা দেখিয়াছি, ধর্ম্মতলা হইতে খিদিরপুর যাইবার জন্য ঝাঁকা মুটে কোন লোকের সঙ্গে দশ পয়সা বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সে তাহা হইতে চারিটী পয়সা খরচ করিয়া খিদিরপুরের পোল পর্য্যন্ত ট্রামে যাইয়া থাকে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—"ঘোড়া দেখ্‌লে খোঁড়া"; যানের সুবিধা থাকিলে আর পা দুখানি চলিতে চায় না, কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু আমরা যখন কলিকাতায় পড়িতাম, তখন বাগবাজার হইতে কালীঘাট পদব্রজেই যাতায়াত করিতাম; তাহাতে যে বিশেষ কষ্ট হইত, তাহাও ত এখন মনে পড়ে না। এখন আর সে দিন নাই! এই সম্বন্ধে একটা সত্য ঘটনা বলিতেছি।

আমাকে কার্য্যোপলক্ষে প্রতিদিনই ধর্ম্মতলা হইতে ট্রামে চড়িয়া শ্যামবাজারের দিকে যাইতে হয়। আমি প্রত্যহ দশটা হইতে সওয়া দশটার মধ্যেই ধর্ম্মতলায় ট্রামে উঠিয়া বসি। সে সময়ে স্কুল কলেজের ছাত্রেরা অনেকেই ট্রামে চড়িয়া, কেহ বা প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে, কেহ বা মেট্রোপলিটান কলেজের সম্মুখে, আর কেহ বা একেবারে হেদোর পুকুরের সম্মুখে নামিয়া থাকেন। আমি প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাইতাম, একটি বছর চৌদ্দ পনর

কিশোর

বয়সের হৃষ্টপুষ্ট ছেলে বহুবাজারের মোড়ে ট্রামে উঠিত, আর প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে নামিয়া রাস্তা পার হইয়া বই বগলে চলিয়া যাইত। আমি কোন দিনই ছেলেটিকে কিছু জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করি নাই।

একদিন আমি যে বেঞ্চে বসিয়া আছি, ধর্ম্মতলা হইতে সেই বেঞ্চে একটি যুবক উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বয়স ঊনিশ কি কুড়ি। অতি সুন্দর চেহারা; চক্ষুতে সোণার চস্‌মা; পোষাকের তেমন পারিপাট্য নাই। হাতে খান দুই মোটা মোটা বই। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, যুবকটি কলেজে পড়েন।

গাড়ী যখন বহুবাজারের মোড়ে গেল, তখন আমার সেই পূর্ব্বকথিত বালকটী গাড়ীতে উঠিয়া আমার ও উক্ত যুবকের মাঝখানে বসিল। রাস্তায় গাড়ীর বিশেষ আধিক্য জন্য আমাদের ট্রামখানি তখনই ছাড়িতে পারিল না। যুবকটি তখন ঐ বালকের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। কথাগুলি আমার ঠিক ঠিক মনে আছে।

যুবক বলিলেন, "ভাই, তুমি কোথায় পড়?"

বালক বলিল, "আমি হিন্দু স্কুলে পড়ি।"

যুবক। কোন্ ক্লাসে পড়?

বালক। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি।

যুবক। তোমার বয়স কত ভাই?

বালক। আমি এই ফাল্গুন মাসে পনর বছরে পড়েছি।

যুবক তখন বালকের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক তাহার নাম বলিল। নামটিও আমার মনে আছে, কিন্তু তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

যুবক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা কয় ভাই ?"

বালক। আমরা দুই ভাই, আমিই বড়, আমার ছোট ভাইটির বয়স চার পাঁচ বছর।

যুবক। তোমার বোন নেই ?

বালক। আছে বই কি। আমার চার বোন, বড় দিদির বিয়ে হয়েছে ; আর তিনটী বোনের এখনও বিয়ে হয় নাই।

যুবক। তোমার বাবা আছেন ?

বালক। আছেন।

যুবক। তিনি কি করেন ?

বালক। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আফিসে চাকুরী করেন।

যুবক। তিনি কত মাইনে পান,—জান ?

বালক। জানি বই কি। তিনি ১৬০৲ টাকা মাইনে পান।

যুবক। তোমাদের কি এখানেই বাড়ী ?

বালক। না, আমাদের বাড়ী হুগলী জেলায়। সেখানে আর এখন ঘর দুয়ার নেই ; আমরা এখানেই থাকি।

যুবক। এখানে কি তোমাদের নিজেদের বাড়ী আছে ?

বালক। না, আমরা ভাড়াটে বাড়ীতে থাকি, ৩৫৲ টাকা বাড়ীভাড়া দিতে হয়।

আমি বসিয়া বসিয়া এই প্রশ্নোত্তর শুনিতে লাগিলাম। যুবকটি যে বালককে এত কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমি মোটেই বুঝিতে পারিলাম না। যুবক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের বাড়ীতে চাকর বামুন আছে ?"

বালক। না, চাকর নেই, একটি ঝি আছে, আর এক জন রাঁধুনী আছে।

যুবক। তা হলে, তোমরা দুই ভাই, তোমাদের তিন বোন, তোমার বাবা, তোমার মা এই সাত জন—কেমন ? ঝি, রাঁধুনী দুই, এই হ'ল নয় জন, কেমন ? আর কেহ কি তোমাদের বাড়ী থাকেন ?

বালক। না, আর কেহ থাকেন না ; তবে মধ্যে মধ্যে কেহ এসে দুচার দিন থাকেন।

যুবক। ভাই, মনে কিছু ক'রো না। আমি একটা হিসাব ক'রছিলাম। আচ্ছা, তুমি রোজই ট্রামে স্কুলে যাও ? আস্‌বার সময়ও ট্রামে বাড়ী এস ?

বালক। হাঁ, দুই বেলাই ট্রামে যাই আসি।

যুবক। দেখ, তোমার বাবা একশত ষাট টাকা মাইনে পান; তাই দিয়ে কল্‌কাতার বাড়ীভাড়া, এত গুলো মানুষের খোরাক চালান, কাপড় চোপড় কেনেন, তোমার বই, স্কুলের মাইনে দেন, তোমার ট্রামের ভাড়া দেন; জলখাবারের পয়সাও দেন ত? কি—বল?

বালক। হাঁ, রোজ চার পয়সার জলখাবার খাই।

যুবক। তোমার বাবার সেই ১৬০৲ টাকায় এত খরচ কুলিয়ে উঠে? জমা জমি কিছু আছে কি?

বালক। না, কিছু নেই। বাবা যা মাইনে পান, তাই দিয়েই সব চালা'তে হয়।

যুবক। তা হ'লে তোমাদের কিছুই থাকে না,—কেমন?

বালক। না, বাবা বলেন, সব মাসে খরচ কুলিয়ে উঠে না।

যুবক। ভাই, মনে কিছু ক'রনা। এ দিকে বল্‌ছ তোমাদের খরচে কুলিয়ে ওঠে না, অথচ তুমি এই বহুবাজারের মোড় থেকে গোলদীঘি পর্য্যন্ত হেঁটে না গিয়ে, রোজ তিন আনা পয়সা ট্রাম ভাড়া দেও কেন? এ কতটুকু পথ? এটুকু যেতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। আর তোমাকে ত রোগা ব'লেও বোধ হয় না। আমার

কথা শুন্‌বে ? আমাদের বাড়ী এই ভবানীপুরে। আমার বাবা ছয়-শ টাকা মাইনে পান। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, আর ছেলে মেয়ে নেই। আমি যখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, তখন বাবা আমাকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। আমি সেখান থেকে এনট্রান্স পাশ করে, প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হই ; এল, এ, বি, এ পাশ করেছি ; এখন এম, এ পড়ি। এই আট বছরের উপর আমি ভবানীপুর থেকে আস্‌ছি। যে দিন নিতান্ত দেরী হয়ে যায়, সেই দিনই আমি ট্রামে চড়ে কলেজে এসে থাকি। বাড়ী যাওয়ার সময় ঝড় বৃষ্টির দিন ছাড়া কোন দিন আমি ট্রামে যাইনে। মাসের মধ্যে বড় বেশী হয় ত পাঁচ ছয় দিন আমি ট্রামে চড়ি ; আর সব দিন হেঁটে আসি। তুমি বল্‌বে, হয় ত আমার বাবা কৃপণ। তা নয় ভাই ! আমার যাতায়াতের খরচ রোজ আট আনা পাই। শরীর সুস্থ আছে, গায়ে বল আছে, আমি ট্রামে চড়ব কেন ? আমি ভবানীপুর থেকে হেঁটে আসি, হেঁটে যাই। যা পয়সা বাঁচে, তা দিয়ে কখন ভাল বই কিনি, কখন গরীব ছাত্রদের বই দিই। কৈ, এত খানি চল্‌তে ত আমার কষ্ট হয় না। আর তুমি ছেলে মানুষ ; তোমার বাবার অবস্থাও তেমন ভাল নয়, তিনি এক পয়সাও সঞ্চয় করতে পারেন না, তোমার তিনটি

বোন এখনও অবিবাহিতা ; আর তুমি কি না বহুবাজারের মোড় থেকে ট্রামে চড়ে গোলদীঘিতে এস ? আমার কথা যদি শোন, তবে কা'ল থেকে এমন কাজ কর' না। যে দিন বাড়ী থেকে বেরুতে দেরী হয়ে যাবে, সে দিন না হয় ট্রামে এস, সব দিন এস না ; আর বাড়ী ফিরে যাবার সময় কোন দিন ট্রামে উঠ না। মাস গেলে হিসেব করে দেখো, তুমি তোমার বাবার চার পাঁচ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছ। আর দুই তিন দিন যেতে যেতেই অভ্যাস হয়ে যাবে। তুমি ছেলে মানুষ ; তুমি এই পথটুকু হাঁটতে পারবে না ? তা হলে যখন বড় হবে, তখন কি ক'রবে ?"

যুবক আর বলিতে পারিলেন না ; গাড়ী তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবক ও বালক উভয়েই গাড়ী হইতে নামিয়া গেল।

তাহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে যুবকটিকে ট্রামে দেখিতে পাই, কিন্তু বালকটিকে একদিনও ট্রামে দেখি নাই। একদিন তাহাকে মেডিকেল কলেজের সম্মুখের ফুটপাথে দেখিয়াছিলাম ; সে তখন পদব্রজে স্কুলে যাইতেছিল। তখন বুঝিলাম, বালক যুবকের সদুপদেশ প্রতিপালন করিয়াছে। আমার সে দিন মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল।

কর্ণমর্দ্দন-কাহিনী।

সে অনেক দিনের কথা। দশ পনর বৎসর নহে, প্রায় পঁয়তাল্লিশ ছয়চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন আমি আমাদের গ্রামের বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমি তখন কি কি বই পড়িতাম, তাহাও আমার মনে আছে। তখন ত আর রকম বে-রকমের এত বই ছিল না। আমরা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম, অক্ষয়-কুমার দত্তের চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, যদুগোপাল চট্টো-পাধ্যায়ের পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, লোহারামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ, গোপালচন্দ্র বসুর ভূগোলসূত্র, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস, বস্তুবিচার (প্রণেতার নাম মনে নাই), প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর পাটীগণিত, আর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রতত্ত্ব। বই নিতান্ত অল্প না হইলেও এখনকার মত বিভীষিকাপূর্ণ ছিল না, আর বোধ হয়, এত কঠিনও ছিল না।

আমি বরাবরই বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইতিহাস ভাল করিয়া পড়িতাম ; ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষায় সাহিত্যে প্রতি বৎসরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইতাম ; ইতিহাস ও ভূগোলে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে না পারিলেও

নিতান্ত কম নম্বর পাইতাম না। কিন্তু আমার যত গোল ঐ অঙ্কের বেলায়। আমি পাটীগণিতে প্রায়ই রসগোল্লা পাইতাম, কোন কোন বার হয় ত সৌভাগ্যক্রমে এক আধটা সামান্য-ভগ্নাংশের অঙ্ক কেমন করিয়া ঠিক হইত ; তাই আট দশ নম্বর পাইতাম। ক্ষেত্রতত্ত্বের কোন তত্ত্বই স্থির করিতে পারিতাম না ; জ্যামিতির গাধার সেতু (Ass's bridge) আমি কোন দিনই পার হইতে পারি নাই ; সমচতুর্ভুজ সমচতুরস্র শুনিলেই আমি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতাম। আমাদের শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিবার ভার ছিল দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের উপর। যে দিন তিনি স্কুল কামাই করিতেন, সে দিন আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতাম ; মনে হইত, যাক্ একদিনের জন্য ত 'গাধা' 'বোকা' প্রভৃতি সুমধুর সম্বোধন হইতে মুক্তিলাভ করিলাম !

আমাদের দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় লোকটি ভাল ছিলেন। আমি যে অঙ্কশাস্ত্রে এমন পণ্ডিত ছিলাম, তবুও তিনি কোন দিন আমাকে প্রহার করেন নাই, গালাগালি পর্য্যন্তই তাঁহার শাসনের সীমা ছিল। কোন দিনই কোন ছাত্রের শরীরে তিনি হস্তার্পণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বাক্য-যন্ত্রণাতেই ছেলেরা লজ্জায় মরিয়া যাইত। সুধু আমারই লজ্জা হইত না; আমি কিছুতেই পাটিগণিত বা ক্ষেত্রতত্ত্বের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে

পারিতাম না ; গালাগালি আমার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল। তবে ইহার মধ্যে আরও একটি কথা ছিল। আমি বাঙ্গালা সাহিত্য ভাল জানিতাম, ক্লাসে উক্ত বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান ছাত্র ছিলাম ; সেই জন্য হেড পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। হেড পণ্ডিত মহাশয়ের প্রিয়পাত্র ছিলাম বলিয়া অন্য কোন শিক্ষক আমাকে কিছু বলিতে সাহস পাইতেন না। প্রতি বৎসর পরীক্ষায় আমি অঙ্কে একেবারে শূন্য পাইয়া 'ফেল' হইলেও আমার প্রোমোসন্ বন্ধ থাকিত না। এমনই করিয়া আমি তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছিলাম।

আমার দুর্ভাগ্য, কি সৌভাগ্যবশতঃ সেই বৎসর আমাদের দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় পর পর তিনবার 'ফেল' হইবার পর মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি যখন আমাদের বাঙ্গালা স্কুলের মায়া কাটাইয়া মহকুমার কাছারীর বটবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন আমাদের যিনি দ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া আসিলেন, তাঁহার নাম হরিবোলা দাস। হরিবোলা নাম শুনিয়াই ত আমরা হাসিয়া অস্থির! আমাদের ক্লাসের মোহিত ভারি দুষ্ট ছেলে। সে "হরিবোলা" নাম শুনিয়াই এক ছড়া বাঁধিল :—

"হরিবোলা, তেঁতুল গোলা, চেটে তোলা।"

তাহার পর আমরা জানিতে পারিলাম যে, হরিবোলা

পণ্ডিত জাতিতেও বড় কম নহেন—তিনি মৎস্যজীবী,—'জেলে ইতি ভাষা'। স্কুলের সম্পাদক মহাশয় বোধ হয়, বহু অনুসন্ধান করিয়া এমন শ্রুতি-সুখকর নামধারী কুলীন পণ্ডিত আনিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নাম রাখিলেন,—'হরিবোল', আবার কেহ নাম রাখিলেন—'জল-ঘোলা পণ্ডিত'। আমি অবশ্য এই সকল তামাসা খুব উপভোগ করিতাম, কিন্তু নিজে কখন 'হরিবোল' বা 'জলঘোলা পণ্ডিত' বলিয়া তাঁহার অসম্মান করি নাই।

আমাদের এই পণ্ডিত মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও পণ্ডিতি করেন নাই ; নর্ম্ম্যাল স্কুল হইতে বাহির হইয়াই আমাদের স্কুলে আসিয়াছিলেন ; সুতরাং পাঠ্যাবস্থার ঝাঁজ তখনও তাঁহার ষোল আনা ছিল।

আমাদের হেড পণ্ডিত মহাশয় গণিত-শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না ; তাই গণিত শিক্ষাদানের ভার দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের উপরই থাকিত। আমাদের হরিবোল পণ্ডিত মহাশয়ও সেই ভার প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি প্রথম দুই একদিন বোধ হয়, আমার গণিত-জ্ঞানের দৌড় বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পরই, আমার বিদ্যা তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইল। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, অথচ মিশ্র ব্যবকলনের অঙ্ক কষিতে পারি না, সমকোণের সংজ্ঞা

বলিতে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সংজ্ঞা বলিয়া বসি ; ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞার ন্যায় অতি সহজ প্রতিজ্ঞার সমাধান করিতে পারি না। এমন পাথুরে গাধা ছেলে যে কেমন করিয়া এতগুলি শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে, তাহা তিনি তাঁহার নর্ম্ম্যাল ত্রৈবার্ষিকের সুদীর্ঘ তিন বৎসরের অভিজ্ঞতাতেও বুঝিতে পারিলেন না। একদিন তিনি বলিলেন, 'তোকে দেখে ত গাধা বলেও মনে হয় না'। তাঁহার এই সার্টিফিকেটের জন্য আমি মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলাম।

তাহার পর একদিন আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার পর ক্লাসের সর্ব্বপ্রথম স্থানে বসিয়া আছি, এমন সময় দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় ক্ষেত্রতত্ত্ব পড়াইবার জন্য আসিলেন। সে সময় আমাদের স্কুলে উঠা নাবা হইত ; উপরে যে ছেলে বসিয়া থাকিত, তাহার কোন উত্তর ভুল হইলে তাহার নীচের ছেলেটি ঠিক উত্তর দিয়া তাহার উপরে যাইত ; এখন আর সে নিয়ম নাই। আমি যেখানেই থাকি না কেন, গণিতের ঘণ্টায়, লাঞ্ছনার ভয়ে একেবারে সকলের নীচে যাইয়া বসিতাম ; সুতরাং আমাকে আর উপর নীচে করিতে হইত না। যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয়কে ক্লাসে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই আমি আমার

স্থান হইতে উঠিয়া নীচের দিকে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "তুমি যেখানে ছিলে সেইখানেই বস; ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?" আমি তখন কি করি, ক্লাসের সর্ব্বপ্রথম স্থানেই বাধ্য হইয়া বসিয়া থাকিলাম।

আমাদের ক্লাসে ছয় জন ছাত্র। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, সমকোণী ত্রিভুজে কয়টি স্থূলকোণ থাকিতে পারে?" আমার দেহ যেমন স্থূল, আমার বুদ্ধিও বোধ হয় তেমনি স্থূল ছিল; তাই সমকোণী ত্রিভুজে স্থূলের অসম্ভাব আমার স্থূল বুদ্ধিতে আসিল না। আমি উত্তর করিলাম, "দুইটা"। পণ্ডিত মহাশয় আমার পরবর্ত্তী বালককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "একটা"। তিনি তৃতীয় বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "একটাও না।" তখন পণ্ডিত মহাশয় হুকুম দিলেন, "ঐ দুইটা গাধার কাণ মলিয়া উপরে যাও।" হুকুম যথারীতি তামিল হইল, —একটা মৃদু কাণমলা খাইয়া সরিয়া বসিলাম। এই আমার ছাত্রজীবনে প্রথম শাস্তি গ্রহণ। আমার ভয়ানক কষ্ট হইল; কাণে মোটেই বেদনা লাগে নাই, কিন্তু প্রাণে বড়ই লাগিল। তাহার পর ক্রমে প্রশ্ন হইতে লাগিল, এবং যদি বা দুই একটার ঠিক উত্তর দিতে পারিতাম, এই অপমানে সে সকলই ভুলিয়া গেলাম; উত্তরগুলি ক্রমেই অদ্ভুত হইতে

লাগিল। এই প্রকারে ক্লাসের পাঁচজন ছাত্রই একে একে আমার কর্ণমর্দ্দন করিয়া উপরে গেল, আমি সকলের নীচে যাইয়া পড়িলাম। তখন আমার মাথা দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল ; আমি সত্য সত্যই চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছিলাম। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে আমাকে যেন কেমন করিয়া ফেলিয়াছিল। আমার কাঁদিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল। আমার মুখের মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বুকের ভিতর পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছিল।

ইহাতেও শাস্তির শেষ হইল না। পণ্ডিত মহশয় যখন দেখিলেন যে, আমার কর্ণমর্দ্দনের জন্য ছাত্রাভাব, তখন তিনি স্বয়ং সেই অভাব পরিপূরণের জন্য আসন ত্যাগ করিলেন এবং আমার নিকটে আসিয়া আমার কাণ ধরিয়া বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিলেন। আমার শাস্তির শেষ হইল। এতক্ষণও আমি চুপ করিয়াছিলাম ; কিন্তু পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, আমি তখন নয় দশ বৎসর বয়সের বালক, আমাকে যে জেলের হাতে কাণমলা খাইতে হইল, ইহাই আমার হৃদয়ে বড় বাজিল। আমি উচ্চ বংশের ছেলে, আমাকে কি না জেলেতে কাণ মলিল। তখন সত্যসত্যই আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, তিনি আমার গুরু, আমি তাঁহার শিষ্য ; তাঁহার জাতির

কথা মনে করায় আমার অপরাধ হয়। আমি তখন কাঁদিয়া ফেলিলাম !

আমার ক্রন্দন দেখিয়া দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "পড়ায় মনোযোগ না দিলে এমনই করে চিরজীবন কাঁদতে হবে, এখনই কি হয়েছে ? যাক্, আজ তোমাকে ক্ষমা কর্‌লাম, তুমি বস।" পণ্ডিত মহাশয় কেমন করিয়া যে ক্ষমা করিলেন, তাহা তখন আমার বালক বুদ্ধিতে আসিল না ; পাঁচ জন ছেলে আমার কর্ণমর্দ্দন করিয়া উপরে উঠিয়া গেল ; তাহার পর পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং কর্ণমর্দ্দন করিয়া আমাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিলেন, ইহার মধ্যে ত ক্ষমার কোন নিদর্শন নাই। তবে তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন ; বোধ হয়, এইটিই তাঁহার ক্ষমা। ছুটীর আর বিলম্ব ছিল না, বিশেষ আমার অভিমানে তখন বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল ; তাই পণ্ডিত মহাশয়ের এই ক্ষমা আমি মাথা পাতিয়া লইলাম না—আমি দাঁড়াইয়াই থাকিলাম।

ছুটী হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে আমার মনে বড়ই ধিক্কার জন্মিল। তখন মনে হইল, গণিত-শাস্ত্রটা এমনই কি, যে আমার তাহা বোধগম্য হইবে না ! এত ছেলে ভাল অঙ্ক কষিতে পারে, ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝিতে পারে, আর আমিই পারিব না ? আমি কি এতই

বোকা ? আর সকল পড়াই ভাল বলিতে পারি, শুধু অঙ্কই জানি না। তাহার জন্য এত লাঞ্ছনা, এত অপমান, এমন গুরুতর শাস্তি ! তখন প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেমন করিয়া হউক অঙ্ক শিখিবই শিখিব। কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিব না, কাহাকেও একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিব না ; নিজের চেষ্টায় নিজের যত্নে গণিত শিখিব। আমার প্রতিজ্ঞা,—পড়াশুনার জন্য আর কখনও শাস্তি গ্রহণ করিব না,—কিছুতেই না।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি মনে বল পাইলাম, আমার হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইল ; স্কুলের সেই শাস্তি, সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিব মনে করিয়া যেন একটু আনন্দ বোধ করিলাম, শান্তি বোধ করিলাম।

সেই দিন বাড়ী আসিয়া আর আমি খেলা করিতে বা বেড়াইতে গেলাম না ; আমার কর্ণমর্দ্দনের প্রধান কারণ ক্ষেত্রতত্ত্ব লইয়া বসিলাম। সে দিন রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত কেবল ক্ষেত্রতত্ত্ব কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম , শুধু কণ্ঠস্থ নহে, সব কথা বুঝিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার পর হইতেই আমার গণিত-শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার জন্মিল। আমার বেশ মনে আছে, আমি এক মাস অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রসন্ন সর্ব্বাধিকারীর পাটীগণিতের প্রায় সমস্ত অঙ্ক কষিয়া শেষ

করিয়াছিলাম, ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ের আটচল্লিশটি প্রতিজ্ঞা আমি সেই এক মাসেই অন্যের সাহায্য না লইয়া শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমাদের তৃতীয় শ্রেণীতে ক্ষেত্র-তত্ত্বের কুড়িটি প্রতিজ্ঞা ও পাটীগণিতের লঘুকরণ পর্য্যন্ত সে বৎসরে পড়িবার কথা ছিল; আমি কিন্তু ছাত্রবৃত্তির সমস্ত পাঠ্যই তৃতীয় শ্রেণীতে শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহার পর যতদিন স্কুল কলেজে লেখাপড়া করিয়াছি, ততদিনের মধ্যে আমার সহাধ্যায়ী, শিক্ষক বা অধ্যাপক কেহই এ কথা বলিতে পারেন নাই যে, আমি গণিত-শাস্ত্রে কাঁচা, আমি একটা নিরেট গাধা। কখনও স্কুলের পরীক্ষায় বা সরকারী পরীক্ষায় আমি গণিতে কম নম্বর পাই নাই, অনেক সময়ে সর্ব্বোচ্চ নম্বরই পাইয়াছি। হরিবোলা পণ্ডিত বা জেলে পণ্ডিতের একদিনের এক কাণমলাতেই আমার এই উপকার হইয়াছিল। তাহার পর কর্ম্মজীবনে অনেক কার্য্যে হয় ত কাণমলা খাইয়াছি, কিন্তু গণিত-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার অভি-যোগে কখনও কাণমলা খাইতে হয় নাই। এখন মনে হয়, জীবনগতি নির্ণয় করিয়া দিবার জন্য যথাসময়ে যদি আর কোন হরিবোলা পণ্ডিত কাণ ধরিয়া ঠিক পথে চালাইয়া দিতেন, তাহা হইলে হয় ত কি হইত, কে জানে?

হারানিধি ।

প্রথম-পক্ষের স্ত্রীবিয়োগের পর শশী সরকার যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিল, তখন তাহার প্রথম-পক্ষের একমাত্র পুত্র রতিকান্তের বয়স পনর বৎসর। রতিকান্ত সেবার প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

শশী সরকার গ্রামের জমিদারের তহশিলদারী করিত। জমিদার-সরকারে বেতন বড়ই কম; শশী সরকার মাসিক আট টাকা বেতন পাইত; তাহাতে তাহার ক্ষুদ্র পরিবারের খরচপত্র এক রকম চলিয়া যাইত। বাড়ীতে ত বেশী লোক ছিল না—শশী, তাহার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র রতিকান্ত।

রতিকান্তকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য শশী ও তাহার স্ত্রীর একান্ত আগ্রহ ছিল; তাই যেমন করিয়া হউক, তাহারা রতিকান্তের পড়াশুনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। এমন সময়ে একদিন শশীর স্ত্রী-বিয়োগ হইল।

পৃথিবীতে এমন কোন আত্মীয়া ছিল না যে, তাহাকে বাড়ীতে আনাইয়া শশী দুবেলা দুমুটা ভাতের ব্যবস্থা করিতে পারে। অতি কষ্টে মাস দুই শশী পুত্রের সাহায্যে ঘর-গৃহস্থালীর কাজ চালাইল; নিজেরাই সংসারের সমস্ত কাজ করিত।

কিন্তু এমন করিয়া কয়দিন সংসার চলে। শশীকে মনিবের কাজকর্ম্ম ত দেখিতে হয়; রতিকান্তেরও সেবার পরীক্ষার বৎসর, তাহাকে একটু অধিক পরিশ্রম করিয়া পড়া-শুনা করার প্রয়োজন। শশী তখন অনন্যগতি হইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিল।

এবার রতিকান্তের যে বিমাতা আসিল, সে খুব গোছালো মেয়ে; তাহার বয়সও প্রায় সতর বৎসর। শশী একটু বড় মেয়ে দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিল; কারণ তাহার এখন সংসারে লোকাভাব। শশীর স্ত্রী আসিয়াই সংসারের ভার গ্রহণ করিল। সে বিধবার একমাত্র কন্যা। মেয়েটিকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইয়া বিধবা মাতা একাকিনী কেমন করিয়া বাড়ীতে থাকেন; তাই কন্যার পশ্চাতে পশ্চাতে তাহার মাতাও আসিয়া শশীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শশী যেমন লোকের অভাবে পড়িয়াছিল; তেমনই তাহার লোকের সদ্ভাব হইল।

শশীর স্ত্রী ও তাহার মাতা আসিয়া দেখিল যে, শশী রতিকান্তকে লইয়াই ব্যস্ত; কিসে তাহার সময়ে খাওয়া হয়, কিসে তাহার পড়ার কোন অসুবিধা না হয়, কিসে তাহার কাপড় চোপড়ের অভাব না হয়, শশী সর্ব্বদাই তাহার তত্ত্বাবধান করিত। পূর্ব্বে যখন রতিকান্তের মা বাঁচিয়া

ছিলেন, তখন শশীকে এ সকল দেখিতে হইত না, দেখিবার প্রয়োজনও সে বোধ করে নাই; কিন্তু এখন দুইটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক আসিয়া যখন গৃহস্থালীর ভার গ্রহণ করিল, তখন শশীকে ছেলের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিতে হইল।

কিন্তু তাহার এই অধিক মনোযোগ শশীর স্ত্রী ও তাহার মাতা ভাল ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। শশীর শাশুড়ী একদিন রতিকান্তকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, "জামাই কি আমাকে পর মনে করেন। আমরা কি তাঁর ছেলেকে অযত্ন করি যে, দিনের মধ্যে চোদ্দ বার ছেলের খোঁজখবর নেওয়া হয়। এ সকল কিন্তু আমার ভাল লাগে না। বিন্দু, আমি ত তোকে বলিয়াছিলাম, আমার এ বাড়ীতে এসে কাজ নাই; তুই ত ছাড়লি নে। কিন্তু জামাইয়ের ভাবগতিক দেখে আমার ভাল বোধ হয় না; শেষে কি অপমান হয়ে এ বাড়ী ছাড়তে হবে।"

কন্যা বিন্দুবাসিনী পূর্ব্ব হইতেই মায়ের মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছিল; রতিকান্ত যে অনর্থক একটা ভার, সতীনের ছেলে যে কোন দিন আপন হয় না, এ সকল উপদেশ সে বিবাহের সম্বন্ধের দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছিল; সে যে তাহার স্বামীকে তিন দিনেই বশ করিয়া ফেলিতে পারিবে,

এ বিশ্বাসও তাহার ছিল। সতর বৎসর বয়সের মেয়ে সবই বুঝিত ; কিন্তু শশীর বাড়ীতে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন সে আত্মপ্রকাশ করে নাই ; সে জানিত, তাড়াতাড়ি করিলে হয় ত হিতে বিপরীত হইতে পারে। তাই এ কয়দিন সে সবই দেখিয়া আসিতেছিল এবং ধীরে ধীরে স্বামীকে মুঠার মধ্যে আনিতেছিল।

পিতার দ্বিতীয়বার বিবাহের পর তিন মাস যাইতে না যাইতেই রত্তিকান্ত বুঝিতে পারিল যে, তাহার এ সংসারে আর স্থান নাই। বিমাতা যে তাহার আপনার জন হইবে না, এ কথা সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত ; কিন্তু তাহার বিশ্বাস ছিল, তাহার স্নেহময় পিতা তাহাকে নিশ্চয়ই তাঁহার স্নেহের বর্ম্মে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবেন। সে মনে করিয়াছিল, কোন প্রকারে ছয়টা মাস কাটিয়া গেলেই ত সে পরীক্ষা দিবে। পরীক্ষায় যে সে উত্তীর্ণ হইবে, সে বিশ্বাসও তাহার ছিল। তাহার পর সে ত আর বাড়ী থাকিবে না। বিমাতা তাহার আর কি করিবে। পিতার স্নেহের উপর নির্ভর করিয়াই সে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই তিন মাসেই সে তাহার পিতার ভাব-পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল ; তাহার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, তাহাকে যে পরিণামে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহা সে এই তিন মাসেই

দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল। তখন পিতা আর তাহার তেমন তত্ত্বতল্লাস করেন না, ক্কচিৎ কখন ডাকিয়া দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহার বিমাতা ও তাহার মাতা নানা প্রকারে তাহার অসুবিধা জন্মাইতে লাগিল। রতিকান্ত এ সমস্ত নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। পিতার নিকট কোন কথা বলিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না ; সে বুঝিয়াছিল পিতা বিমাতার কথাই অধিক বিশ্বাস করিবেন।

যাহা হউক, দুঃখে কষ্টে রতিকান্তের পরীক্ষার দিন সমাগত হইল। শশী তাহার পরীক্ষার ফিস্ দিবার সময় যে প্রকার ভাব দেখাইয়াছিল, তাহাতে রতিকান্ত বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, অতঃপর তাহার আর পড়াশুনার সুবিধা হইবে না।

যথাসময়ে রতিকান্তের পরীক্ষার ফল বাহির হইল ; সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল ; কিন্তু বৃত্তি পাইল না। তখন সে পিতাকে বলিল "বাবা, এখন আমি কি করিব ?"

তাহার পিতা তাহাকে বলিল "আর কি করিবে ? এখন একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখ। তোমার কলেজের খরচ যে চালাই, এ সামর্থ্য আমার নাই। যে সামান্য কয়টা টাকা পাই, তা'তে সংসার চলাই কষ্টকর হইয়াছে, তোমার পড়ার খরচ চালাইব কেমন করিয়া !"

বলা বাহুল্য যে, শশী সরকার ইচ্ছা করিলে জমিদার বাবুদের ধরিয়া পুত্রের পড়ার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু শশী তাহা করিল না। তাহার স্ত্রী তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, গরীব মানুষের ছেলের পক্ষে এইটুকু বিদ্যাই যথেষ্ট। কলেজের খরচ চালানো কি যার তার কাজ ? সে আরও তার স্বামীকে বুঝাইল যে, রতিকান্ত অতি অবাধ্য ছেলে ; তাহার জন্য আর খরচ-পত্র করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।

পিতার কথা শুনিয়া রতিকান্ত বলিল, "কলেজে পড়ার সমস্ত খরচ যে আপনি চালাইতে পারিবেন না, তাহা আমি বুঝি। আপনি যদি বেতনের টাকাটা দেন, তাহা হইলে আমি বাবুদের ধরিয়া খাওয়ার ব্যবস্থাটা করিয়া লইতে পারি। আর দুইটী বৎসর পড়িয়া দেখি।"

শশী বলিল, "আমি কি আর সে চেষ্টা করি নাই ? বাবুরা কিছুতেই রাজী হইলেন না ; তাঁহাদেরও মত যে, তুমি এখন একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখ। দেখচ ত, সংসারের খরচ-পত্র বেড়ে গেছে ; আমি একলা কুলিয়ে উঠ্‌তে পারি না। এ সময় তুমি যদি দশটা করে টাকাও মাসে আন্‌তে পার, তা' হ'লে আমার সাহায্য হয়।"

রতিকান্ত এ কথার আর কোন উত্তর করিল না।

জমিদার বাবুদের কাছে আবেদন করিলে যে, কোন ফল হইবে না, তাহা সে বুঝিতে পারিল। সে তখন স্থির করিল, যেমন করিয়া হউক, কলিকাতায় যাইয়া সে তার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। চেষ্টা-যত্ন করিয়াও যদি তাহার কলেজে পড়ার সুবিধা না হয়, তখন যাহা হয় করা যাইবে।

কিন্তু কলিকাতায় ত তাহার কোন আত্মীয় নাই। গ্রামের যে দুই চারিটি ছেলে কলিকাতায় আসিয়া পড়াশুনা করে, তাহাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল যে, কলিকাতা তেমন স্থান নহে; সেখানে কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে না। তাহার মত অল্পবয়সের ছেলেকে কেউ 'টিউসনী'ও দেবে না তাহার পক্ষে যে পড়িবার চেষ্টা না করাই ভাল, এই কথাই তাহার বন্ধুগণও তাহাকে বলিল। এই প্রকারে চারিদিক হইতে বাধা পাইয়া রতিকান্তের পড়িবার ইচ্ছা আরও প্রবল হইল। সে একবার চেষ্টা না করিয়া কিছুতেই পড়াশুনা ত্যাগ করিবে না, বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। কিন্তু কলিকাতায় যাইতে ত পয়সার প্রয়োজন। যাওয়ার খরচ আছে, সেখানে যাইয়া যে কয়দিন চেষ্টা করিবে, সে কয়দিন ত বাসাখরচ করিতে হইবে। এ টাকা কোথা হইতে সে সংগ্রহ করে? পিতার নিকট চাহিলে তিনি যে একটি পয়সাও দিবেন না, এ কথা রতিকান্ত বেশ

বুঝিতে পারিয়াছিল। অবশেষে সে এক কাজ করিল; সে গোপনে তাহার বইগুলি বেচিতে আরম্ভ করিল; প্রবেশিকার পাঠ্য-পুস্তকের ত আর প্রয়োজন হইবে না। বই বিক্রয় করিয়া সে নয় টাকা এগার আনা পয়সা পাইল! এই সামান্য নয় টাকা এগার আনা পয়সা এবং খান দুই কাপড় ও গোটা দুই জামা সম্বল করিয়া একদিন রাত্রিশেষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া রতিকান্ত গৃহত্যাগ করিল।

পরদিন অনেক বেলা পর্য্যন্তও যখন রতিকান্ত গৃহে ফিরিল না, তখন শশী তাহার অনুসন্ধান করিল। বাড়ীর কেহই কোন সংবাদ দিতে পারিল না। শশী তখন গ্রামের মধ্যে রতির সহপাঠী দুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা রতিকান্তের কলিকাতা যাওয়ার অভিপ্রায়ের কথা জানিত; তাহারা শশীকে সে কথা বলিল। শশী এই কথা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। ছেলেমানুষ, কখনও গ্রাম ছাড়িয়া বিদেশে যায় নাই, সহায়-সম্বল কিছুই নাই,—রতিকান্ত এ কি করিল? শশীর প্রাণের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। হাজার হউক সন্তান ত বটে! কিন্তু সে আর কি করিবে? অনেক চিন্তা করিয়া সে কলিকাতায় দুই এক জনকে রতিকান্তের অনুসন্ধানের জন্য পত্র লিখিল। নিজে কলিকাতায় যাইয়া কি করিবে? আর যাইতে চাহিবারও

সাহস তাহার হইল না—বিন্দুবাসিনী কি তাহাতে সম্মতিদান করিবে! শশীর মনের দুঃখ মনেই জাগিয়া রহিল।

এদিকে রতিকান্ত কলিকাতায় যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রতিবেশী হরিশ ঘোষাল কলিকাতায় এক বড়-মানুষের বাড়ী সরকারী করিতেন। বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী ও মাতা ছিলেন। রতিকান্ত অনেক সময় ঘোষাল মহাশয়ের পত্র আসিলে তাহা পড়িয়া দিত এবং তাঁহার স্ত্রী বা মাতা কলিকাতায় পুত্রের নিকট যে চিঠিপত্র লিখিতেন, রতিকান্তই তাহা লিখিয়া দিত। এই কারণে রতিকান্ত ঘোষাল মহাশয়ের ঠিকানা জানিত। রতিকান্ত পূর্ব্ব হইতেই মনে স্থির করিয়াছিল যে,সে কলিকাতায় যাইয়া প্রথমে হরিশ ঘোষালের বাসাতেই উঠিবে এবং সেখানে থাকিয়া চারিদিকে চেষ্টা দেখিবে। হরিশ ঘোষাল অবশ্যই পাঁচ সাত দিনের জন্য তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিতে অস্বীকার করিবেন না। শশী সরকারের কিন্তু হরিশ ঘোষালের কথা মনে হয় নাই; সে মনে করিয়াছিল, রতিকান্ত কলিকাতায় যাইয়া দেশের ছাত্রদিগের কাহারও মেসে আশ্রয় লইবে, তাই সে হরিশ ঘোষালকে পত্র লেখার প্রয়োজন মনে করে নাই।

রতিকান্ত পাড়াগেঁয়ে ছেলে হইলেও সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে যে কলিকাতায় আসিয়া

একেবারে অকূল সাগরে পড়িবে, এ কথা তাহার মনেও হয় নাই। নিজের উপর নির্ভর করিয়াই ত সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল।

রতিকান্ত শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চোরবাগানে হরিশ ঘোষালের মনিববাড়ী উপস্থিত হইল। হরিশ ঘোষাল হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রতিকান্ত ঘোষাল মহাশয়ের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। রতিকান্তের কথা শুনিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তাই ত রতি! তুমি ছেলেমানুষ, কলিকাতার হাল অবস্থা ত জান না। এখানে বড় ভাই ছোট ভাইকে প্রতিপালন করিতে চায় না, এ এমনই কঠিন ঠাঁই। তা এসেছ, চেষ্টা ক'রে দেখ। কিন্তু বাবা, আমার ত মনে হয়, তুমি কিছু ক'রে উঠতে পারবে না। তা, এখানে কোথায় থাক্‌বে মনে ক'রে এসেছ?"

ঘোষাল মহাশয় যে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, রতিকান্ত তাহা মনেও করে নাই। এ কথার উত্তর দিতে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু লজ্জা করিলে চলিবে না ভাবিয়া সে বলিল, "আমি আপনার আশ্রয়েই এসেছি। আপনি পাঁচ সাত দিন আমাকে আশ্রয় দিন, আমি চেষ্টা ক'রে দেখি। তারপর কোন

ফল না হয়, তখন বাড়ী চ'লে যা'ব, আর না হয় আর কোথাও যা'ব।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন "তাই ত, রতিকান্ত, আমার মনিব মহাশয়ের হুকুম ছাড়া ত এ বাড়ীতে আর কাহারও থাক্‌বার যো নেই। তিনি ভারি কড়া লোক; কাউকে কোন রকম সাহায্য করেন না; অন্য লোককেও বাড়ীতে স্থান দেন না; তাই ত, এখন কি করা যায়!"

রতিকান্ত দেখিল যে, তাহাকে আশ্রয় দেওয়া ঘোষাল মহাশয়ের ইচ্ছা নহে; কিন্তু রাত্রি হইয়াছে; এখন সে এই কলিকাতা সহরে কোথায় যায়? সে তখন বলিল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। যে কোন প্রকারে আজকার রাত্রিটি আমাকে এখানে একটু শুয়ে থাক্‌বার স্থান দেন, কাল সকালে উঠে আমি একটা থাকবার স্থান খুজে নেব!"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তাই ত, কি করা যায়, তাই ভাবছি।"

এমন সময় তাঁহার মনিব কোথা হইতে বেড়াইয়া বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার নাম আর বলিব না। তাঁহার অবস্থা খুব ভাল, বৎসরে প্রায় ষাট হাজার টাকা আয়। নিজে বেশ লেখা পড়া জানেন; সংসারও বড় নহে। কিন্তু লোকটার দয়ামায়া নাই। নিজের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিয়া

থাকেন, কিন্তু দুঃখী দরিদ্রকে কখনও একটি পয়সা সাহায্য করেন না, তাঁহার দ্বারে আসিয়া কেহ একমুষ্টি চাউলও কোন দিন পায় নাই।

সরকারের ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় বাবু দেখিলেন, ঘরের মধ্যে একটি অপরিচিত বালক বসিয়া আছে। তিনি তখন দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এ ছেলেটি কে, হরিশ ?"

হরিশ বলিলেন "এটি আমাদের গ্রামের একটি গরীব মানুষের ছেলে। এবার এণ্ট্রান্স পাশ দিয়েছে। অবস্থা বড়ই খারাপ; পড়াশুনা করবার খুবই ইচ্ছা। তাই কলিকাতায় এসেছে, যদি কোন প্রকারে পড়বার উপায় হয়।"

বাবু বলিলেন, "তা এখানে কেন ?"

হরিশ বলিলেন "এখানে ত কাউকে ও চেনে না,—জানে না। তাই এইমাত্র এসে এখানে উঠেছে।"

বাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "গরীব মানুষের ছেলেদের কি আর এখন পড়া চলে—খরচ কত! যাদের কিছু নেই, তাদের বেশী পড়বার সখ করতে নেই। তা তুমি কি করবে ঠিক করেছ ছোকরা ?"

রতিকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "শুনেছি, কলিকাতা

খুব বড় স্থান। এখানে অনেক ধনী, বিদ্বান্ লোক আছেন। তাঁ'দের ধ'রে কি আমার পড়ার একটা উপায় হ'বে না?"

বাবু হাসিয়া বলিলেন, "পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কল্‌কাতার খবর ত জান না। এখানে দয়া-ধর্ম্ম নেই। যার যার—তার তার।" তাহার পর হরিশ ঘোষালের দিকে চাহিয়া বাবু বলিলেন "দেখ হরিশ, আমার এখানে বাইরের লোকজনের স্থান হ'বে না। আর এখনকার ছেলে পিলে, কার মনে কি আছে, বলা ত যায় না। আমি বাপু, কাউকে স্থান দিতে পারব না। তুমি বল্‌ছ ওর এখানে চেনা-শুনা কেউ নেই। বেশ, আজ রাত্রিটা ও এখানেই থাকুক, কা'ল সকালে বিদেয় ক'রে দিও। আমি আমার বাড়ীতে হোটেলখানা করতে পারব না।" এই বলিয়া শিক্ষিত, পদস্থ, লক্ষ-টাকার অধিপতি বাবু উপরে চলিয়া গেলেন। রতিকান্ত হতাশভাবে ঘোষাল মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "শুন্‌লে ত রতি, বাবুর কথা, তাঁর হুকুম। যা'ক, আজকের রাতটা ত এখানে থাক; কা'ল যা হয় কোরো। কি বল?"

রতিকান্ত বলিল, "তা ছাড়া আর উপায় কি? এত রাত্রে আর কোথায় যা'ব। এই খানেই পোড়ে থাকব।"

এই বলিয়া স্নেহময়ী মায়ের কথা স্মরণ করিয়া সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে রতিকান্ত বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ঘোষাল মহাশয় তখন একজন আম্রবিক্রেতার সহিত দরদস্তুর করিতেছিলেন। রতিকান্ত যখন বলিল, "তা হ'লে আমি এখন যাই," তখন ঘোষাল মহাশয় তাহার মলিন মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি অতি বিষণ্ণ মুখে বলিলেন "তা কি কোরবো বাবা! শুনেছ ত বাবুর হুকুম। তাঁর কিছুরই অভাব নেই; তা কি বল্‌ব বল।"

আম্রবিক্রেতা এই কথা শুনিয়া রতিকান্তের মুখের দিকে একবার চাহিল; তাহার মলিন মুখখানি দেখিয়া কি জানি কেন হঠাৎ তাহার প্রাণের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। সে তখন ঘোষাল মহাশয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছেলেটি কে, সরকার মশাই?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ছেলেটি আমাদের গ্রামেরই এক গরীব কায়স্থের ছেলে; এবার পাশ দিয়াছে। অবস্থা ভাল নয়; বাড়ীতে বাপ আছে, মা নেই, বিমাতা আছে। তারা ছেলের পড়ার খরচ দিবে না, দিতেও পারে না। ওর

কিন্তু পড়ার ভারি ইচ্ছা। তাই ও এখানে এসেছে, যদি চেষ্টা ক'রে কা'রও সাহায্যে পড়তে পারে।"

আমওয়ালা বলিল "তা, এখন ও কোথায় যাচ্ছে?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কাল রাত্রে এখানে এসেছিল। রাত্রিটা এখানেই ছিল। আমাদের বাবুর হুকুম, তাঁর বাড়ীতে অন্য কেউ থাকতে পারবে না। তাই ও এখন চলে যাচ্ছে।

আমওয়ালা রতিকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "বাবা, তুমি এখন কোথায় যা'বে?"

রতিকান্ত বলিল "তা ত জানিনে। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, তারপর যা অদৃষ্টে থাকে হ'বে!"

আমওয়ালা বলিল, "তোমরা ত কায়স্থ?"

রতিকান্ত বলিল, "আমরা কায়স্থ।"

আমওয়ালা তখন বলিল, "বাবা, আমিও কায়স্থ, দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ। লেখাপড়া শিখি নাই, তাই এখন ফিরি-ওয়ালার কাজ করি। তা বাবা, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আমার বাসায় চল না? যে কয়দিন তোমার কিছু স্থির না হয়, আমার ওখানেই থাকবে। আমি কিন্তু খোলার ঘরে থাকি! আমার আর কেউ নেই—একলাই থাকি।"

আমওয়ালার এই কথা শুনিয়া রতিকান্ত যেন অকূল সাগরে কূল পাইল। সে যে কি বলিয়া এই অশিক্ষিত আমওয়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তাই কর না, রতি" !

রতিকান্ত বলিল, "ওঁর কাছেই ত যা'ব, কিন্তু উনি যে এমন করে আমাকে আশ্রয় দিতে চাইলেন, তা'র জন্য আমি যে কি বলব তাই ভেবে পাচ্ছি না।"

আমওয়ালা বলিল, "সে সব কিছু ভাবতে হবে না, বাবা ! সরকার মশাই ! আর দরদস্তুরে কাজ নেই ; সাড়ে তিন টাকা শ', নিতে হয় নিন, আর না হয় চলে যাই। যে একটা ছোট ছেলেকে দু'দিনের জন্য আশ্রয় দিতে পারে না, তার দুয়োরে আমি আম বেচি না ; তার দুয়োরে আর আস্‌ব না। এরা বড়মানুষ, না কাঙ্গাল !"

এই বলিয়া আমওয়ালা আমের বোঝা মাথায় তুলিয়া রতিকান্তকে বলিল, "চল বাবা, বাসায় যাই। আজ আর আম বেচে কাজ নেই।"

রতিকান্তকে সঙ্গে লইয়া আমওয়ালা এ গলি, সে গলি পার হইয়া বাগবাজারে তাহার বাসায় লইয়া গেল।

আমওয়ালার নাম হরিনাথ দাস। তাহার বাড়ী যশোহর জেলায়। বহুদিন হইতে সে কলিকাতায় আছে। আমের সময় আম বিক্রয় করে, অন্য সময় কুলপী-বরফ বিক্রয় করে। বৎসরে একবার করিয়া বাড়ী যায়, একমাস থাকিয়া আসে। আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সেই বৎসর ফাল্গুন মাসে হরিনাথ বাড়ী গিয়াছিল। সেবার তা'দের গ্রামে বড়ই ওলাউঠা লাগিয়াছিল। এই রোগে হরিনাথের সর্ব্বনাশ হইল। প্রথমে তাহার পনর বৎসর বয়সের ছেলেটি গেল; তাহার পর সাত দিন যাইতে না যাইতেই একমাত্র সন্তানের শোকে তাহার গৃহিণীও সেই পথে চলিয়া গেলেন। হরিনাথের সংসারের সমস্ত বন্ধন খসিয়া গেল। মাস দুই সে আর কলিকাতায় আসিল না; মনে করিল, আর কেন? যা'দের জন্য রোজগার, তা'রা ত চ'লে গেল! এখন যা দু'পয়সা হাতে আছে, আর বাড়ী খানি বেচে যা হয়, গুছিয়ে নিয়ে কাশীতে গিয়ে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দিই; কিন্তু তাহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। উপার্জ্জনের স্পৃহা তাহার ছিল না; কিন্তু কলিকাতার পথে পথে ফিরি করিয়া বেড়ান তাহার যেন একটা নেশা হইয়া গিয়াছিল। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল, মনে স্থির করিল, আরও কিছুদিন যাক্, তারপর কাশী যাইবে।

এই সময়ে রতিকান্তকে সে পাইল! রতিকান্ত দেখিতে তাহারই সেই মৃত ছেলেটির মত! তাহার রামনাথ বাঁচিয়া থাকিলেও ত এইবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিত। পাশ করিয়া সেও ত কলিকাতায় এমনই করিয়া পড়িতে আসিত। হরিনাথ মনে করিল, ভগবান তাহার রামনাথকেই রতিকান্ত করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন; সে তাহার হারা-নিধিকে ফিরিয়া পাইয়াছে। রতিকান্তের মুখ দেখিয়া হরিনাথ পুত্রশোক ভুলিয়া গেল। তাহাকে বাসায় আনিয়া আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিল। তাহার পর তাহাকে নিজের জীবনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিল; রতিকান্ত নীরবে শুনিতে লাগিল। অবশেষে হরিনাথ বলিল, "বাবা রতিকান্ত, তুমিই আমার রামনাথ! ভগবানই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, বাবা! তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার পড়াশুনা লালন-পালনের ভার ভগবান আমার উপর দিয়েছেন। তুমি যে আমার রামনাথ!—তুমি যে আমার হারানিধি!"

রাঙ্গা ব্যাপার

আমি গরীব স্কুল-মাষ্টার। স্কুল-মাষ্টারেরা প্রায় সকলেই গরীব, আমি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম। বরাহনগরে বাড়ী। আমার পূজনীয় পিতৃদেব ছোট একখানি একতলা কোঠাঘর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাই বলিতে পারিতেছি, আমার বাড়ী আছে। বি, এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই বাবা মারা যান, আমিও সেই বৎসর বি, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া চাকুরীর সন্ধান করিতে বাধ্য হই। উমেদারী করিবার অবসর ছিল না, কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিবার উপায় ছিল না, মাস গেলেই নগদ টাকার প্রয়োজন, নতুবা সপরিবারে অনাহারের ব্যবস্থা। তাই, যে কর্ম্মে শিক্ষানবিশী নাই, উমেদারীও খুব বেশী করিতে হয় না, সেই স্কুল-মাষ্টারীতে লাগিয়া গেলাম। আজও গোলাম, কালও গোলাম! এই তের বৎসর স্কুল-মাষ্টারীই করিতেছি। প্রথম ৩৫৲ টাকায় প্রবেশ লাভ করি, তাহার পর এই তের বৎসরে দুই বারে দশ টাকা বাড়িয়া এখন ৪৫৲ টাকায় আটক পড়িয়াছে, আর বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। বি, এ ফেলের পক্ষে ৪৫৲ টাকা বেতনের স্কুল-মাষ্টারী; বিশেষতঃ, এই কলিকাতা সহরে—খুব বেশী, তাহার অধিক আশা করিতে নাই।

আঁশা করা কর্ত্তব্য নহে তাহা জানি; কিন্তু অভাব-নামক পদার্থটি অনেক সময়েই কর্ত্তব্যের ধার ধারে না। আমার অবস্থাটা শুনুন। বাবার মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমার বিবাহ হয় এবং আমি যখন কলেজে পড়ি, তখনই পিতৃদেব পৌত্রীর মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর এই ১৪ বৎসরে আমার একটি পুত্র এবং আর একটি কন্যা লাভ হইয়াছে।

আজ ছয়মাস হইল, অনেক চেষ্টায় বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়াছি। মাষ্টারী করিয়াও যাহা দুই পয়সা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা কন্যার বিবাহে উড়িয়া গিয়াছে; তাহা ছাড়া একটি বন্ধুর নিকট তিনশত টাকা ধার করিতে হইয়াছে। তাহার একটি পয়সাও শোধ দিতে পারি নাই। আমি ত পারিব না, যদি এগার বৎসর বয়সের পুত্র অজিতকুমার লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হয় এবং যদি তাহাকে স্কুল-মাষ্টারী করিতে না হয়, তাহা হইলে হয় ত কালে বন্ধুবর তাঁহার টাকা পাইলেও পাইতে পারেন।

শ্রাবণ মাসে মেয়ের বিবাহ দিয়াছি। দুই মাস যাইতে না যাইতেই পূজা আসিল। অবস্থা যেমনই হউক, নূতন জামাইকে পূজার-তত্ত্ব করিতে হইল। ছেলে-মেয়েরা প্রতি বৎসর পূজার সময় সামান্য ধূতি জামা প্রভৃতি যাহা পাইত, এবার তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। পূজার তত্ত্বের জন্য দোকানে

কিছু ধার হইল। তাহার পরেই শীতের তত্ত্ব আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেদিন যখন জামাইয়ের জন্য শীতবস্ত্র কিনিতে যাই, তখন গৃহিণী বলিলেন "দেখ, ছেলে-মেয়ের পূজার কাপড় ত হইলই না। এবার বড় শীত পড়িয়াছে; অজিতের র‍্যাপারখানা একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে; আর গায়ে দেওয়া চলে না। জামাইয়ের গায়ের কাপড় আনতে যাচ্ছ, ছেলেটার জন্যও যেমন তেমন দেখে কম দামের মধ্যে একখানি গায়ের কাপড় নিয়ে এস।"

আমি 'আচ্ছা' বলিয়া বাজারে বাহির হইলাম, এবং বড়বাজারের প্রায় সমস্ত দোকানে ঘুরিয়া অবশেষে জামাতার জন্য ২৬৲ টাকা মূল্যের একখানি আলোয়ান এবং আমার একমাত্র পুত্র অজিতকুমারের জন্য সাড়ে পাঁচ টাকা মূল্যের একখানি র‍্যাপার কিনিয়া আনিলাম। অজিত সেই র‍্যাপারখানি পাইয়াই কত খুসী!

ইহার সাত আট দিন পরে একদিন অপরাহ্ণকালে স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখি, মহা গণ্ডগোল! গৃহিণী উত্তেজিত-স্বরে অজিতকে বলিতেছেন, "তুই কেন দিয়ে এলি? দশখানা আছে কি না, তাই একখানা দান করা হ'ল।" অজিত কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি, ব্যাপার কি? ছেলেটাকে অমন ক'রে বক্‌ছ কেন? ও কি করেছে?"

গৃহিণী স্বরটা আরও একটু উচ্চে চড়াইয়া বলিলেন, "কর্‌বে আবার কি? করেছে আমার মাথা!"

আমি বুঝিলাম, গৃহিণীর মাথাটা তখন ঠিক নাই। সে অবস্থায় কোন কথা বলা বা প্রতিবাদ করা নিতান্তই অসঙ্গত মনে করিয়া আমি ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলাম এবং কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ডাকিলাম, "অজিত, একবার এদিকে এস ত বাবা!"

আমার ডাক শুনিয়া অজিত ঘরের মধ্যে আসিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার দু'টি মেয়েও আসিল। আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই আমার সাত বৎসরের কনিষ্ঠা কন্যা বলিল, "বাবা শুনেছ, তুমি সেদিন দাদাকে যে রাঙ্গা র‍্যাপারখানা কিনে দিয়েছিলে, সেখানি দাদা কোন্ ভিখিরীকে দিয়ে এসেছে। তাই মা দাদাকে বক্‌ছিলেন। দাদা, নূতন কাপড়খানা তুমি বিলিয়ে দিতে গেলে কেন? বক্‌বে না? কি বল বাবা!"

আমি বলিলাম, "আগে সকল কথা শুনি; তারপর যা হয় বল্‌ব। হ্যাঁ বাবা অজিত, কি হয়েছে?"

অজিত কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "বাবা, আজ চারটের পর

যখন স্কুল থেকে আস্‌ছিলাম, তখন দেখি বড় রাস্তার মোড়ের কাছে একটা বউ ছোট একটা ছেলেকে কোলে ক'রে ব'সে আছে। ছেলেটি খুব ছোট, তার গায়ে একটু কাপড়ও নেই ; তার মায়ের যে ময়লা কাপড় তাও একেবারে ছেঁড়া। মা শীতে কাঁপছে, ছেলেটি তার কোলের মধ্যে, সেও কাঁপছে। তাই দেখে আমার মন্‌টা বড় কেমন হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওগো তোমরা এমন ক'রে ব'সে আছ কেন?' আমার দিকে চেয়ে মা বল্লে, 'বাবা, আমরা বড় গরীব, খেতে পাইনে, শীতেও ম'রে যাচ্ছি।' বাবা, সে কথা শুনে আমার তখন মনে হ'ল, আজই ত স্কুলে পড়ে এলাম, 'গরীব-দুঃখীকে দয়া করিও ; যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য করিও।' পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন, 'এ শুধু পড়লে হয় না, এই রকম কাজ কোরো।' আমার সেই কথা মনে হ'ল। আমি তখন তাকে আমার র‍্যাপারখানা দিতে গেলাম। মা'টা কিছুতেই নিতে চায় না। আমি বল্‌লাম, 'আমার আরও গায়ের কাপড় আছে। তোমরা এখানি নিলে আমার বাবা মা রাগ ক'রবেন না', এমনই কত কথা বল্‌তে তবে মা র‍্যাপারখানা নিয়ে তার ছেলের গায়ে জড়াইয়া দিল। তা বাবা, আমার গায়ের কাপড়ের দরকার নেই, আমার যে পুরাণো র‍্যাপার আছে, আমি তাই গায়ে দেব। ছেঁড়া হ'লেও তাতে শীত মানে।"

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আমার বড় মেয়ে বলিল, "তা তোর যদি এত দয়াই হ'য়েছিল তা হ'লে তাদের বাড়িতে ডেকে এনে তোর পুরাণো র‍্যাপারখানা দিলেই পারতিস্; নূতনখানা তুই কেন দিতে গেলি?"

অজিত বলিল, "দিদি, তখন ও কথা আমার মনেই হয় নাই। বাড়িতে ডেকে আন্‌লেই ঠিক হ'ত, তারা দু'টো খেতেও পেত, না দিদি?"

আমি তখন অজিতকে কোলের কাছে টানিয়া লইলাম। সে সময়ে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কথায় বলিবার শক্তি আমার হইল না। জীবনে আমি এমন সুখ কখনও অনুভব করি নাই, এত আনন্দ আমার কখনও হয় নাই। আমার মত দরিদ্র লোকের ছেলের হৃদয় এত উচ্চ! আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম! আমি তখন কথা বলিতে পারিলাম না; আনন্দে, সুখে আমার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আমি অজিতকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম, তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। তখন ভুলিয়া গেলাম যে, আমি দরিদ্র, আমি ঋণগ্রস্ত! আমি এমন ছেলের পিতা! আমি রাজাধিরাজ অপেক্ষাও আপনাকে অধিক সৌভাগ্যবান মনে করিলাম।

আমার কন্যা দুইটি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; এদিকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ-ধারা নীরবে সেই বালকের মস্তকোপরি বর্ষিত হইতে লাগিল। একখানি সামান্য রাঙ্গা র্যাপার একটি মানব-শিশুকে সেবত্বে অভিষিক্ত করিল।

ফার্ষ্ট প্রাইজ

কলিকাতা মাণিকতলার খালের ধারে ছোট একখানি খোলার বাড়ীতে বসিয়া মা ও মেয়ে কথা বলিতেছেন। মায়ের বয়স পঞ্চাশ, মেয়েটির বয়স কুড়ি একুশ বৎসর; সে বিধবা, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। ঘরের মধ্যে জিনিস-পত্র নাই বলিলেই হয়। সামান্য কয়েকখানি লেপ তোষক বালিশ; থালা বাসন কিছুই নাই, একটি মাত্র ঘটি ঘরের মধ্যে এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে। দুই তিনটি টিনের বাক্স ঘরের এক কোণে রহিয়াছে; খাট তক্তপোষ কিছুই ঘরে নাই। ঘরের অবস্থা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, ভীষণ দারিদ্র্য এই গৃহস্থের গৃহ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রমণী দুইটিকে দেখিলে কিন্তু মনে হয়, তাঁহারা চিরদিনই এই অবস্থায় ছিলেন না। তাঁহাদের অবস্থা এককালে ভাল ছিল, ভীষণ দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁহারা এই ক্ষুদ্র জীর্ণ খোলার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহাদের সম্মুখে একখানি ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া একটি দশ এগার বৎসর বয়সের ছেলে মিটমিটে প্রদীপের আলোকে পড়িতেছে। ছেলেটি দেখিতে অতি সুন্দর; তাহার মুখের দিকে চাহিলেই তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

মা বলিলেন, "এখন উপায়! যা কিছু ছিল, সকলই ত গেল; আর ত বিক্রীর মত কিছুই নাই। কা'ল সকালেই যে বাড়িওয়ালা ভাড়ার জন্য আস্‌বে। তার দুইটি টাকা কোথায় পাব? তার পর কা'ল যে ছেলেটির মুখে কি দেব, তা ত ভেবেই পাচ্ছি নে, ঘরে যে কিছুই নাই। হা অদৃষ্ট!"

মেয়ে বলিল, "ভেবে কি হবে মা! অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। এতদিন যা করি নাই, কা'ল থেকে তাই করব; কাল থেকে ভিক্ষায় যাব। আর উপায় কি?"

মা বলিলেন, "না নিরু, তা হবে না। এই ঘরে প'ড়ে তিনজনে মরব, তাও স্বীকার, ভিক্ষা করতে পারব না।"

নিরুপমা বলিল, "তা ছাড়া আর কি পথ আছে? পাশের বাড়ীর ওদের বলেছি যে ওদের বাড়ীর পুরুষেরা যদি কোন দোকান থেকে সেলাইয়ের কাজ এনে দেন, তা হ'লে আমরা সেলাই ক'রে দিতে পারি; তাঁরা আমাদের পরিশ্রমের জন্য যা দয়া ক'রে দেবেন, তাই আমরা নেব। ও বাড়ীর বাবু ত বলেছেন, আজ যা হয় একটা ঠিক ক'রে আস্‌বেন। এখনও তাঁর আস্‌বার সময় হয় নাই। তিনি বাড়ী এলেই ও বাড়ীর মেয়েরা খবর দিয়ে যাবেন।"

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দেখ।" তাহার পর ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অমর, কা'ল ত

তোমাদের প্রাইজ, কা'ল ত আর পড়া হবে না। তবে আর আজ এত রাত্রি পর্য্যন্ত নাই পড়লে। এখন বই তুলে রেখে যে কয়টি ভাত আছে, তাই খেয়ে ঘুমাও।"

অমর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, কা'ল পড়া হবে না, কিন্তু আমাকে একটা কবিতা মুখস্থ বল্‌তে হবে। সেটা এই কাগজে লিখে এনেছি; সেইটা বেশ ভাল ক'রে মুখস্থ করছি; কি জানি কা'ল অত লোকের মধ্যে যদি হঠাৎ ভুলে যাই, তা হ'লে আমি ত লজ্জা পাবই, মাষ্টার মহাশয়েরাই বা কি বল্‌বেন। তাঁরা বিনে মাইনেতে পড়াচ্চেন, দরকার হ'লে দুই একখানা বইও কিনে দিচ্চেন। তাই সে কবিতাটা বারবার পড়ছি। দিদিকে একবার শুনিয়েছি, তখন একটা কথাও বাধে নি। কেমন দিদি?"

নিরুপমা বলিল, "হাঁ, বেশ মুখস্থ হয়েছে, উচ্চারণও ঠিক হয়েছে। যেখানটা যেমন ক'রে বল্‌তে হবে, তাও ঠিক হয়েছে। তবে কা'ল অত লোকের মধ্যে মাথা ঠিক থাক্‌লেই হয়। দেখ অমর, তোমাকে কাল যখন আবৃত্তি করবার জন্য ডাক্‌বে, তখন তুমি লোক জন কারু দিকে চেয়ে দেখো না। যেটা তোমাকে বল্‌তে দিয়েছেন, সেটা ঈশ্বরের স্তোত্র কি না। তুমি এক কাজ করো। তুমি নতশিরে হাতযোড় ক'রে বেশ ধীরে ধীরে বল্‌তে আরম্ভ করো, মনে

করো, যেন তুমি এই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে কবিতা শোনাচ্ছ। কেমন, তা পারবে?"

অমর বলিল, "দিদি, তুমি যদি সেখানে আমার সম্মুখে ব'সে থাক্‌তে পারতে, তা হ'লে আমার একটুও ভয় হ'ত না। দিদি, তুমি যা বল্‌লে আমি তাই করব, মনে মনে ভাব্‌ব যেন দিদির সম্মুখেই পড়ছি।"

মাতা স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "ভগবান আছেন, তাঁর নাম স্মরণ রাখিও, তোমার পড়া খুব ভা'ল হ'বে।"

নিরুপমা বলিল, "অমর, তখন একবার আমাকে শুনিয়েছিলে, মা ত শোনেন নাই। এখন একবার মাকে শোনাও। যদি কোথাও কিছু ভুল থাকে, তা ঠিক হ'য়ে যাবে।"

তখন অমর দাঁড়াইয়া নতশিরে হাতযোড় করিয়া পরলোকগত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করিল।—

"কে রচিল, এ বিশাল পৃথিবী সুন্দর,
আকাশের চাঁদ আর নক্ষত্র নিকর?
কাহার আদেশে রবি লোহিতবরণ,
প্রভাতে উঠিয়া করে আলো বিতরণ?
শীতল বাতাস আসি কাহার কৃপায়,
ধীরে ধীরে সকলের শরীর জুড়ায়?

জান কি, রে শিশু ! তুমি কার দয়াবলে,
সুখে বাস করিতেছ, এই ভূমণ্ডলে ?
ঈশ্বর তাঁহার নাম, বড় দয়াময়,
পরম আরাধ্য তিনি, মঙ্গল-আলয় ।
তাঁহার কৃপায় আছে বাঁচি জীবগণ,
সকলেরে সদা তিনি করেন পালন ।
ভক্তিভরে যোড়করে, মিলি জনে জনে,
প্রণিপাত কর, শিশু ! তাঁহার চরণে ।”

এমন সুন্দর ভাবে, এমন প্রাণের আবেগে অমর ঐ কবিতাটি আবৃত্তি করিল যে, শুনিতে শুনিতে মাতার চক্ষে জল আসিল। অমরের কবিতা পাঠ শেষ হইলে মাতা উঠিয়া পুত্রকে কোলে করিয়া বলিলেন, “বাবা, মনে রেখো, ঈশ্বর তাঁহার নাম বড় দয়াময়’ ।”

নিরুপমা বলিল, “অমর, কা'ল ঠিক যদি এমন ক'রে বল্‌তে পার, তা হ'লে সকলেই ভাল বল্‌বেন। তোমার বেশ মুখস্থ হয়েছে। আজ আর রাত জেগে কাজ নেই। এখন ভাত খেয়ে সকাল সকাল ঘুমাও। কা'ল সকালে উঠে আবার পাঁচ সাত বার এমন ক'রে পড়ো, তা হ'লেই হবে” ।

অমর বলিল, “দিদি, আজ রাত্তিরে আর ভাত খাব না।

এই ত স্কুল থেকে এসে মুড়ি খেয়েছি ; তাতেই আমার খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে। ও ভাত কয়টি রেখে দাও, কা'ল স্কুলে যাওয়ার সময় খেয়ে যাব। মা যে এখনই বল্‌ছিলেন, ঘরে কিছু নেই, কা'ল কি হবে! ঐ ভাত কয়টি থাক্‌লেই কা'ল আমার খাওয়া হবে। তার পর তোমরা কা'ল কি খাবে, দিদি!"

নিরুপমা বলিল, "সে ভাবনা তুমি ভেবো না, অমর! ভগবান কা'ল যা দেবেন, তাই আমরা খাব। কা'ল কি হবে তাই ভেবে আজ না খেয়ে থাক্‌বে, তা হবে না। লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ভাত বেড়ে দিই, খাও। কা'লকার ভাবনা কা'ল হবে।"

নিরুপমা আর কথা বলিতে পারিল না ; তাহার মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অমর এগার বৎসরের বালক, সে সকল বুঝিতে পারিল। মুখখানি মলিন করিয়া সে একবার মায়ের মুখের দিকে, একবার দিদির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর নিরুপমা তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে বাড়িওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরুপমা ও তাহার মাতা তাহাকে তাঁহাদের অবস্থার কথা বলিয়া কয়েকদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন। বাড়ি-

ওয়ালা প্রথমে ত কোন কথাই শুনিতে চায় না ; শেষে সে যখন দেখিল যে, সে দিন কোন প্রকারেই কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন বলিল, সে দুইদিন পরে আসিবে। সে দিন যদি ভাড়ার টাকা না পায়, তাহা হইলে যে জিনিস-পত্র আছে, সমস্ত আটক করিয়া তাঁহাদিগকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিবে। বাড়িওয়ালার এই অপমানজনক কথা শুনিয়া নিরুপমার মাতা নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কোথা হইতে তাঁহারা টাকা পাইবেন ? তাঁহাদের এ সংসারে আর কে আছে ? যিনি এ পৃথিবীতে একমাত্র আশ্রয় ছিলেন, তাঁহাকে ত ছয়মাস পূর্ব্বে নিমতলার ঘাটে রাখিয়া আসিয়াছেন। বিপদে বিহ্বল হইয়া তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, অনাথঅনাথার আরও একজন আশ্রয় আছেন ; তিনি কখনও কাহাকেও ভুলিয়া যান না। এই অসময়ে তাঁহার নাম নিরুপমার মাতার স্মরণ হইল না, তিনি হতাশ হৃদয়ে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া বালক অমর বলিল, "মা, তুমি কেঁদ না। তুমিই ত কাল আমাকে ব'লে দিয়েছ, 'ঈশ্বর তাঁহার নাম, বড় দয়াময়।' সেই দয়াময়ই আমাদের টাকা দেবেন, আমাদের খেতে দেবেন। তুমি ভাব কেন মা!"

পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া মাতা যেন হৃদয়ে বল পাইলেন; তঁ'হার মনে হইল, কে একজন যেন এই বালকের মুখ দিয়া তাঁহাদের জন্য অভয়বাণী প্রেরণ করিলেন। তিনি তখন পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন; কোন কথা বলিবার মত অবস্থা তখন তাঁহার ছিল না।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই নিরুপমা পার্শ্বের বাড়ীর গৃহিণীর নিকট হইতে আধ সের চাউল ধার করিয়া আনিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি সেই ভাত চড়াইয়া দিল এবং উঠানের বেগুন গাছে তিনটি বেগুন ধরিয়াছিল, তাহারই একটি আনিয়া ভাতে দিল। যথাসময়ে সেই বেগুনভাতে ভাত খাইয়া অমরনাথ প্রাইজ আনিবার জন্য স্কুলে যাইতে প্রস্তুত হইল। সে আজ পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার পাইবে। তাহার পর তাহার আবৃত্তি। আবৃত্তি যদি খুব ভাল হয়, তাহা হইলে সে আরও একটা পুরস্কার পাইতে পারে। পূর্ব্ব দিনই নিরুপমা ভাইয়ের কাপড় ও জামাটা আধ পয়সার সাবান আনিয়া কাচিয়া রাখিয়াছিল; আর ত ভাল কাপড়, কি যেমন তেমন কাপড়ও নাই। ঐ একখানি কাপড় ও একটা জামা এখন অমরের একমাত্র পরিধেয় হইয়াছে। আর সকলই তাহার মাতা একে একে বেচিয়া ফেলিয়াছেন। কেমন অভাবে পড়িলে যে মাতা প্রাণাধিক পুত্রের বস্ত্র বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা

যে বড় দরিদ্র সেই বুঝিতে পারিবে, অপরকে কেমন করিয়া তাহা বুঝাইব।

আজ অমর একটু বিলম্বে স্কুলে গেলেও পারিত, কারণ অপরাহ্ণ চারিটার সময় পুরস্কার বিতরণ হইবে; কিন্তু সে আর বিলম্ব করিতে পারিল না, সাড়ে দশটা বাজিতে না বাজিতেই সে স্কুলে চলিয়া গেল। যাইবার সময় মা ও দিদির পদধূলি লইল! উভয়েই প্রাণের সহিত তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হইল। সহরের অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত লোক এই বিদ্যালয়ের পুরস্কার-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের একজন দেশীয় বিচারপতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে গান হইল, তাহার পর রিপোর্ট পাঠ হইল। তাহার পর প্রথমে উচ্চশ্রেণীর কয়েকটি ছাত্র ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দ্দূ কবিতা আবৃত্তি করিল। সর্ব্বশেষে অমরের ডাক পড়িল। দিদির শিক্ষামত সে ধীরে ধীরে সভাপতি মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার পর নতমুখে করযোড়ে,অমর তাহার কবিতা আবৃত্তি করিল। তাহার মধুর-কণ্ঠনিঃসৃত সেই শুদ্ধ আবৃত্তি শুনিয়া সভাপতি মহাশয় ও

উপস্থিত ভদ্রলোকেরা ধন্য ধন্য করিলেন। অমর সকলকে নমস্কার করিয়া নিজের আসনে যাইয়া উপবেশন করিল; প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বেশ অমরনাথ, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর আবৃত্তি হইয়াছে।" অমর অবনতমস্তকে এই প্রশংসা গ্রহণ করিল।

তাহার পরই পুরস্কার-বিতরণের সময় উপস্থিত হইল। প্রথমে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পুরস্কার পাইল। অমর পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার পাইবে। তাহাকে যখন ডাকা হইল, তখন সে ধীরে ধীরে যাইয়া সভাপতি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সভাপতি মহাশয় তাহার হস্তে পুরস্কারের পুস্তক দিলেন। সে পুরস্কারের পুস্তকগুলি লইয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া সভাপতি মহাশয়ের দিকে চাহিয়া অতি ধীরস্বরে বলিল, "আমি এই বই প্রাইজ চাই না" এই বলিয়াই সে মস্তক অবনত করিল। সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য ভদ্রলোক বালকের এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। সভাপতি মহাশয় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তুমি বই চাও না, তবে কি চাও?" অমর বলিল, "আমরা খেতে পাই না, আমার মা, দিদি খেতে পায় না। আমরা যে খোলার ঘরে থাকি, তার ভাড়া দিতে পারি না। আজ সকালে বাড়িওয়ালা এসে ব'লে গিয়েছে, দুই দিন পরে যদি বাড়িভাড়ার টাকা

না দিতে পারি, তবে সে আমাদের বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবে। আমার এই বইগুলো রেখে আমাকে দুইটি টাকা দিন, তা হলে আর বাড়ীওয়ালা আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারবে না।"

বালকের এই দুঃখের কাহিনী, তাহার এই সরল প্রাণস্পর্শী কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেরই চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। সভাপতি মহাশয় রুমালে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "তোমার বাপ ভাই কি কেহই নাই?" এই বার প্রধান শিক্ষক মহাশয় উত্তর করিলেন, "আজ ছয়মাস হইল অমরের পিতার মৃত্যু হইয়াছে; সংসারে উপার্জ্জন করিবার লোক আর কেহই নাই। একদিন অমরের মা আমার বাড়ীতে গিয়া উহাকে ফ্রি করিবার জন্য অনুরোধ করেন, সেই সময় উহাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়াছিলাম। উহাকে স্কুলের বেতন দিতে হয় না। বইগুলিও আমরাই সংগ্রহ করিয়া দিই।" এই কথা শুনিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "অমর, বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন?" অমর বলিল, "মা আছেন, আর আমার দিদি আছেন। দিদি বিধবা, তাঁহারও কেউ নেই।" সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "তোমাদের এতদিন কেমন করিয়া চলিল?" অমর বলিল, "আমাদের যাহা কিছু ছিল, সব বিক্রী হয়ে গিয়েছে। আমার কাপড় জামা পর্য্যন্ত বিক্রী

ক'রে চাল ডাল কিন্‌তে হয়েছে। আমার এই একখানি কাপড়, আর এই একটা জামা, আর নাই। আমাদের—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "অমর, তোমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না। তুমি এখন বইগুলি লইয়া তোমার জায়গায় যাও। সভার কাজ শেষ হইলে তোমাকে আবার ডাকিব।" অমর সভাপতি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া তাহার আসনে যাইয়া উপবেশন করিল।

অন্যান্য পুরস্কার বিতরণ হইয়া গেলে যখন আবৃত্তির পুরস্কার বিতরণের সময় আসিল, তখন অমর নাথ সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লইবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। অমরনাথ সভাপতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে সভাপতি মহাশয় স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার একখানি বড় পুস্তক তাহার হস্তে দিলেন এবং তাহার পর পকেট হইতে ১০৲ টাকার পাঁচখানি নোট বাহির করিয়া বলিলেন, "অমরনাথ, তোমার আবৃত্তির পুরস্কার আমি এই ৫০টি টাকা দিলাম। আর মাসে মাসে তোমাদের খরচের জন্য তোমার এই হেড-মাষ্টার বাবুর হাতে আমি কুড়িটি করিয়া টাকা দিব; তিনি তোমাদের দিবেন।" তাহার পর হেড-মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি এই ছেলেটির ও ইহার মা বোনের তত্ত্বাবধান করিবেন। ঐ কুড়ি টাকা বাদে ইহাদের যখন

:যা দরকার হবে, আমাকে বল্‌বেন, আমি তা আপনার হাতে দেব। আর অমরকে নিয়ে আপনি মাঝে মাঝে আমার ওখানে যাবেন।" সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। সভাপতি মহাশয় যখন অমরের হাতে পাঁচখানি নোট দিতে গেলেন, তখন অমর বলিল, "এত টাকা! আমাদের এত টাকা দিলেন কেন?" সভাপতি মহাশয় বলিলেন "এ তোমার আবৃত্তির পুরস্কার।" হেড-মাষ্টার মহাশয়ের আদেশ অনুসারে অমর হাত পাতিয়া নোট পাঁচখানি লইল।

পুরস্কার বিতরণ শেষ হইয়া গেলে হেড-মাষ্টার মহাশয় অমরকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ীতে গেলেন। অমর মায়ের হাতে পঞ্চাশ টাকার পাঁচখানি নোট দিয়া বলিল "মা, এই দেখ, দয়াময় টাকা দিয়াছেন। দিদি, হেড-মাষ্টার মহাশয় বাহিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তোমাদের কি বলবেন।" নিরুপমা বলিল, "যাও অমর, তাঁকে ভিতরে নিয়ে এস।"

অমর মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া আনিতে গেল, নিরুপমা তাড়াতাড়ি ছেঁড়া মাদুরখানি সেই কুটীরের বারান্দায় পাতিয়া দিল। হেড-মাষ্টার উঠানে আসিলে অমর তাঁহাকে বসিতে বলিল। তিনি বসিলেন না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে দিনের সমস্ত কথা বলিলেন। হেড-মাষ্টার বাবুর কথা শুনিয়া নিরুপমা অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া বাহির

হইয়া আসিয়া মাষ্টারমহাশয়ের চরণে প্রণাম করিয়া অতি ধীর স্বরে বলিল, "আমরা বড় কষ্টে পড়িয়াছিলাম, আপনাদের দয়ায় আমরা প্রাণ পাইলাম। এখন আমার ভাই যাহাতে মানুষ হয়, দয়া করিয়া তাই করিবেন।" মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন। অমর তখন তাহার দিদিকে বলিল, "দেখ দিদি, আমি মুখস্থ বলবার সময় দেখলাম, তুমি আমার সুমুখে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছ! তখন আর আমার ভয় রইল না। তখন তুমি যেমন বলে দিয়েছিলে, ঠিক তোমার দিকে চেয়ে তেমন ক'রে কবিতা বলেছিলাম। তাই আমি ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছি।" নিরুপমা ভাইটিকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

সরস্বতীর কৃপা

"মা, বাবা যে বলেছিলেন, সরস্বতী পূজার পর আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি কোরে দেবেন ; তা, আর সাতদিন পরেই সরস্বতী পূজা ; তার পরই কিন্তু আমি ইংরাজী স্কুলে যাব।"

মা বলিলেন, "তিনি ত বোলে গিয়েছিলেন, কিন্তু তোমার স্কুলের মাইনে, বই, এ সব কেমন ক'রে হবে, তা ত আমি ভেবে পাচ্ছিনে।"

ছেলে বলিল, "বাবা বোলেছিলেন, ঘরে ব'সে ফার্ষ্টবুক শেষ ক'রে ফেল্‌লেই তিনি আমাকে ইংরাজী স্কুলে দেবেন ; তাই ত আমি এই এক মাসের মধ্যে বইখানা শেষ ক'রেছি। সে দিন দত্তদের রমেশ নানা রকম প্রশ্ন ক'রেও আমাকে ঠকাতে পারেনি, আমি বইখানির আগাগোড়া মুখস্থ ক'রে ফেলেছি। দেখ মা, ও পাঠশালায় আমি আর যাবো না, ছেলেগুলো বড় খারাপ, তারা কত খারাপ কথা বলে, সিগারেট খায় ; আমাকেও সেদিন সিগারেট খাওয়াবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করেছিল, তা আমি কিছুতেই খাইনি; তাতে তারা কত ঠাট্টা কোরলে, একজন ত আমাকে মেরেই বসেছিল। গুরুমশাইকে বলে দিতে ভয় হ'ল, বলে দিলে তারা আমাকে আরও মারত। সেই জন্যই ত ও

পাঠশালায় যেতে চাইনে। তার পর সেখানে ত ইংরাজী পড়া হয় না। ইংরাজী পড়তেই হবে, কেমন মা ?”

মা বলিলেন, “এখন একটু ইংরাজী পড়তেই হয়, শুধু বাঙ্গালাতে আর এখন চলে না। সবই ত বুঝি বাবা, কিন্তু কেমন ক’রে কি হবে, তাই ভাবনা। তিনি মাসে নয়টি টাকা পাঠিয়ে দেন, তাতে যে সংসার-খরচই চলে না। স্কুলে এক টাকা মাইনে, তার উপর বই আছে, কাপড় জামা জুতোও চাই।”

ছেলে বলিল, “না মা, সে সব চাইনে; আমি এখনকার মত খালি পায়ে, শুধু চাদর গায়ে দিয়েই স্কুলে যাব। আমরা গরিব মানুষ, জুতো জামা কোথায় পাব, কেমন মা ?”

মায়ের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। একমাত্র সন্তান অখিল, তাহাকে একখানি ভাল কাপড়, কি এক জোড়া জুতা কিনিয়া দিবার শক্তিও তাঁহাদের নাই। স্বামী কলিকাতায় চাকুরী করেন, মাসে মাসে নয়টি করিয়া টাকা পাঠান; তাতেই সংসার চলে। সংসার বড় নয়—স্ত্রী, ছেলে এবং একটি বিধবা ভগিনী। এখন যে দিন-কাল পড়িয়াছে, তাহাতে নয় টাকায় তিনটি মানুষের কিছুতেই মাস চলে না; খাজানা আছে, টেক্‌স আছে, লোকটা-জনটা আছে; গৃহস্থের বাড়ী,

ভিখারীকেও এক মুঠা না দিলে চলে না। ছেলে পাঠশালায় পড়ে, মাসে মাসে চারি আনা বেতন দিতে হয়। এই সম্মুখে সরস্বতী পূজা; স্কুলের মাষ্টার সব ছেলের কাছে চাঁদা আদায় করিয়া সরস্বতী পূজা করিবেন; অখিলকে আট আনা দিতে বলিয়াছেন; আট আনা না হউক, চারি আনা পয়সা দিতেই হইবে। গরিব ভদ্রগৃহস্থের কত খরচ—নয়টি টাকায় কি চলে? অখিলের মা এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলেন।

মাতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অখিল বলিল, "মা, পিসি-মা ত একবেলাই খান; তা এখন থেকে আমরাও না হয় একবেলা খাব; তা হলে যে খরচ বাঁচবে, তাতে স্কুলের মাইনে হবে না? বই না কিন্‌লেও চল্‌বে, আমি এর ওর বাড়ী গিয়ে তাদের বই দেখে পড়ে আস্‌ব।"

অভাগিনী মাতা আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দশ বৎসর বয়সের কচি ছেলে একবেলা উপবাস করিতে চায়। এ যে শক্তি-শেলের আঘাত অপেক্ষাও অধিক!

মাতা নয়নজল সংবরণ করিতে পারিলেন না, পুত্রটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর অঞ্চলে চক্ষু

মুছিয়া কহিলেন, "না বাবা, তোমাকে একবেলা না খেয়ে থাকতে হবে না। তোমার যাতে পড়া হয়, তা আমি করব। আর ত কিছু নেই, রূপোর একছড়া গোট আছে; তাই বেচ্‌লে যেমন করে হোক কুড়িটে টাকা হবেই, তোমার এক বছরের পড়ার খরচ চল্‌বে। এর মধ্যে কি আর ওঁর কিছু মাইনে বাড়বে না?"

মায়ের কথা শুনিয়া অখিল বলিল, "না মা, তা' হবে না, আমি ইংরাজী স্কুলে যাব না, আমি বাড়ী ব'সেই পড়ব। পাঠশালাতেও যাব না; দত্ত-বাড়ীর রমেশ আমাকে খুব ভালবাসে; রোজ তার কাছে পড়ব, তাতেই হবে। তার পর বাবার যখন মাইনে বাড়বে, তখন না হয় স্কুলে যাব, কেমন মা?"

মা বলিলেন, "স্কুলে না গেলে কি পড়া-শুনা হয়? আর বাড়ীতে কে কয় দিন পড়া ব'লে দেবে? তোমাকে তা' ভাবতে হবে না। সরস্বতী পূজার পর তোমাকে স্কুলে দেব। মা সরস্বতী যদি কৃপা করেন, তা' হলে এ কষ্ট চিরদিন থাক্‌বে না।"

ছেলে তখন বলিল, "মা, এবার আমি পাঠশালায় সরস্বতীর অঞ্জলি দিতে যাব না; চাঁদার পয়সা দিয়ে আস্‌ব; এবার বাড়ীতেই পূজা করব।"

মা কি বলিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার ননদ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "কিরে অখিল, কি বল্‌ছিলি ?"

অখিলের কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাহার মা বলিলেন, "দিদি, ও বলে কি এবার বাড়ীতেই সরস্বতী পূজা করবে।"

অখিলের পিসি বলিলেন, "তা বেশ ত, বাড়ীতেই পূজা হবে, ও বাড়ীতেই অঞ্জলি দেবে।"

অখিলের মা বলিলেন, "দিদি, তাতে যে খরচ আছে। যেমন করে হোক একটা টাকা ত লাগ্‌বেই ; চারটে চিড়ে মুড়কী বাতাসা ত চাই, ফলমূলও চাই, নৈবিদ্যিও চাই, পুরুতের দক্ষিণাও চাই।"

অখিলের পিসি বলিলেন, "সে তোমার ভাবতে হবে না। ওর যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন বাড়ীতেই পূজা করব। ও ত কোন দিনই কিছু বলে না। খরচের কথা বল্‌ছ ? তোমার মনে নেই, সেই যে পূজার পর আমার ভাসুরপো এসেছিল ; সে আমাকে একটা টাকা দিয়ে প্রণাম করেছিল। সেই টাকাটা ত খরচ হয়নি, তুলেই রেখেছিলাম ; সেইটেই খরচ করব।"

পিসি-মাতার কথা শুনিয়া অখিল বলিল, "পিসি-মা, খুব ভক্তি কোরে পূজা করতে হবে। কেন, তা জান ? এই

সরস্বতী পূজার পরই আমি ভাল ক'রে ইংরাজী পড়া আরম্ভ করব। মা সরস্বতীকে ভক্তি ক'রে পূজা দিয়ে পড়া আরম্ভ করলে মা সরস্বতীর কৃপা হবেই, কেমন পিসি-মা ?"

পিসি-মা বলিলেন, "তা হবে বই কি ! ভক্তি ক'রে ডাক্‌লে তিনি কি না শুনে থাক্‌তে পারেন।"

অখিলের তখন আর এক কথা মনে পড়িল। সে বলিল, "মা, আমাকে একটা পয়সা দিতে পার ?"

মা বলিলেন, "পয়সা কি হবে ?"

অখিল বলিল, "মা, বাড়ীতে সরস্বতী পূজা হবে, বাবাকে খবর দেওয়া হবে না ? বাবাকে সরস্বতী পূজায় বাড়ী আস্‌তে লিখে দিই। সরস্বতী পূজায় তাঁদের নিশ্চয়ই ছুটী আছে। সেই পূজার পর কলিকাতায় গেছেন, আর ত আসেন নাই ! একখানা পত্র লিখে দিই, কেমন পিসি-মা ?"

পিসি-মা বলিলেন, "তা লিখে দে। দাদা কতদিন বাড়ী আসেননি, এই সময় না হয় একবার আসুন।"

অখিল তখন মায়ের নিকট হইতে একটি পয়সা লইয়া ডাকঘর হইতে একখানি পোষ্ট-কার্ড কিনিয়া আনিল; পোষ্টকার্ড লিখিয়া পিসি-মাতাকে পড়িয়া শুনাইল; তাহার পর কার্ডখানি ডাকঘরে দিয়া আসিল।

(২)

যথাসময়ে পোষ্ট-কার্ডখানি অখিলের পিতা উমেশচন্দ্র রায়ের নিকট পৌঁছিল। উমেশচন্দ্র কলিকাতায় এক দোকানে মুহুরীগিরি করেন। পূর্ব্বে তিনি একটা সওদাগরি আফিসে কাজ করিতেন। সেখানে বেতন ছিল ২৫৲ টাকা; তাহা হইতে ১৫৲ টাকা বাড়ীতে পাঠাইতেন, দশটাকা নিজের খরচের জন্য রাখিতেন। এক বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়, তখন তিনি এক মাসের বিদায় লইয়া বাড়ীতে আসেন। অবস্থা যেমনই হউক, দশজনের অনুরোধে মায়ের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে তাঁহার একশত টাকা ধার হয়। শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া কলিকাতায় যাইয়া তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি যে আফিসে কর্ম্ম করিতেন, সে আফিসের কয়েকটি লোক কমান হইয়াছিল, তিনি সেই দলে ছিলেন। শুনিলেন তাঁহার চাকুরীতে জবাব হইয়াছে।

উমেশচন্দ্র চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলেন। বাড়ীতে খরচ না পাঠাইলে একদিনও চলিবার যো নাই; তাহার পর একশত টাকা ধার! কি উপায় করিবেন, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। চাকুরীর উমেদারীতে অনেক স্থানে ঘুরিলেন। অবশেষে একটা দোকানে আঠারো টাকা

বেতনে মুহুরীগিরি চাকুরী পাইলেন। তিনি এখন সেই চাকুরীই করিতেছেন।

আঠারোটি টাকা বেতন। ইহার দ্বারা কি হইবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন, মাসে মাসে নয়টি করিয়া টাকা বাড়ীর খরচের জন্য পাঠাইবেন। অবশিষ্ট নয় টাকার মধ্যে পাঁচটি করিয়া টাকা ধার শোধ দিবেন; কারণ যিনি টাকা ধার দিয়াছেন, তিনি সুদ লইবেন না, তবে তাঁহার টাকাটা যাহাতে সত্বর পরিশোধ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ অবস্থায় যত কষ্টই হউক না কেন, এমন উপকারী বন্ধুকে মাসে মাসে টাকা দিতেই হইবে। এই দুইটি খরচ বাদে তাঁহার হাতে রহিল চারিটি টাকা। তিনি স্থির করিলেন, একবেলা কোন হোটেলে আহার করিবেন; দিবা ভাগে অনাহারে থাকিবেন এবং কোন একটি বন্ধুর গৃহে শয়ন করিয়া থাকিবেন। এই এক বৎসর তিনি তাহাই করিতেছেন। এত কষ্ট করিয়া তিনি সংসার চালাইতেছেন। এ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে বাড়ী যাওয়া অসম্ভব। কলিকাতা হইতে মেমারী রেলে যাইতে খরচ আছে। সে খরচ তিনি কোথায় পাইবেন?—কত দরিদ্রের সংসার এমন করিয়াই চলিতেছে।

অখিলের পোস্ট-কার্ড উমেশ বাবু পাইলেন বটে, কিন্তু হাতে পয়সা নাই, কেমন করিয়া তিনি বাড়ী যাইবেন? তিনি স্থির করিলেন, সরস্বতী পূজা চলিয়া যাক, তখন পত্রের উত্তর দিবেন। আর উত্তরই বা কি দিবেন? অখিল স্কুলে ভর্ত্তি হইবার কথা লিখিয়াছে, তাহার উত্তর তিনি কি দিবেন? তিনিই ত বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, সরস্বতী পূজার পর অখিলকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। এখন কি বলিয়া সে কথার অন্যথা করিবেন। বাড়ীর খরচ দশ টাকা পাঠাইলে হয়; কিন্তু তাহা হইলে এদিকে একবেলা আহারও যে অনেকদিন বন্ধ করিতে হয়। উমেশচন্দ্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

মঙ্গলবারে সরস্বতী পূজা; দোকানের অন্য যে সকল লোক বাড়ী যাইবেন, তাঁহারা সকলেই সোমবারে একটু সকাল সকাল বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন; দুই একজন লোক, উমেশচন্দ্র ও দোকানের কর্ত্তা দোকানে রহিয়াছেন।

দোকানের মালিকের নাম শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু। কলিকাতাতেই বাড়ী, অবস্থা ভাল, দোকানটিও বেশ চলিতেছে। অবিনাশ বাবুর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। তিনি

বেশ শিক্ষিত লোক, কাজকর্ম্মও ভাল বোঝেন। নিজেই দোকানের সমস্ত কাজ দেখেন।

সোমবার সন্ধ্যার সময় তিনি দেখিলেন যে, দোকানের অধিকাংশ কর্ম্মচারী চলিয়া গিয়াছে, কেবল উমেশচন্দ্র তখন কাজ করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমেশ বাবু, আপনি সরস্বতী পূজায় দেশে গেলেন না ?"

উমেশচন্দ্র বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, "আজ্ঞে,—যাওয়া হোল না।"

অবিনাশ বাবু বলিলেন, "কেন ?—দু'দিন বন্ধ, বাড়ী গেলেও পারতেন ; পূজার পর ত আপনি বাড়ী যাননি !"

উমেশচন্দ্র বলিলেন, "বাড়ী যেতে হ'লে খরচ-পত্র আছে ; হাতে কিছু নেই, তাই গেলাম না।"

অবিনাশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাইনের টাকা কি সবই খরচ হয়ে যায় ?"

উমেশচন্দ্র বলিলেন, "এখানে যা পাই, তাতে কুলায় না। সংসার-খরচ আছে, এখানকার খরচ আছে, তার উপর কিছু ধারও আছে।"

অবিনাশ বাবু বলিলেন, "বাড়ীতে কত পাঠান, আর ধার শোধের জন্যই বা কি দেন ?"

উমেশচন্দ্র বলিলেন "আঠারো টাকা মাইনে পাই ;

নয়টি টাকা বাড়ীতে দিই, পাঁচটি টাকা ধার শোধ দিই, বাকী চারিটি টাকায় এখানকার খরচ চালাই।”

অবিনাশ বাবু বলিলেন, “চার টাকায় চলে কি ক'রে? আপনার বোধ হয় বাসা-খরচ লাগে না!”

উমেশচন্দ্র বলিলেন, “আজ্ঞে,—বাসা-খরচ করতে হয় বই কি!”

অবিনাশ বাবু বলিলেন, “বাসা-খরচ করতে হয়! বলেন কি? চার টাকায় যে মাসে একবেলার খোরাকীও চলে না! আর কোথাও কিছু পান বুঝি?”

উমেশচন্দ্র বলিলেন, “আজ্ঞে না, ঐ আঠারোটি টাকাই সম্বল। চারটি টাকায় দু'বেলার আহার চলে না ব'লে, রোজ একবেলা খেয়েই থাকি, দিনে আর কিছুই খাই না। এ সকল কথা কাকেও বলিনে; আপনি মনিব, জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তাই বল্‌তে হোল।”

উমেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া অবিনাশ বাবু বড়ই ব্যথিত হইলেন। আহা! ভদ্রলোকের ছেলের এত কষ্ট! একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, “আপনার যে এত কষ্ট, তা' ত আমাকে একদিনের জন্যও জানান নাই।”

উমেশচন্দ্র বলিলেন, “আমার মত অবস্থা যাদের, তাদের সকলেরই ত এই রকম কষ্ট! আর সে কথা

আপনাকে জানিয়ে কি করব? আমার অবস্থার কথা জানিয়ে যদি বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করি, তা হ'লে ত আর একজনও চাইতে পারে। আমাদের মত যারা গরিব, তাদের সকলের দুঃখ ঘুচাতে গেলে কি আপনার চলে? আপনি আমার কাজকর্ম্ম দেখে সন্তুষ্ট হ'য়ে যখন মাইনে বাড়িয়ে দেবেন, তখন হয় ত আমার অবস্থা একটু সচ্ছল হবে। আমার চলে না ব'লে ত আপনার উপর দাবী করতে পারি না।"

উমেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া, অবিনাশ বাবু বড়ই সন্তুস্ট হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাড়ীতে পরিবার কয়টি?"

উমেশচন্দ্র বলিলেন, "বাড়ীতে আমার স্ত্রী আছে, একটি ছেলে আছে, আর একটি বিধবা ভগিনী আছে।"

অবিনাশ বাবু বলিলেন, "ছেলেটি কত বড়, পড়া-শুনা করছে কি?"

উমেশচন্দ্র বলিলেন, "ছেলেটি দশ বছরের; সে গ্রামের পাঠশালায় পড়ে। খরচে কুলাইতে পারি না বলে, তাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করতে পারছি না। এই সরস্বতী পূজার পর তাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব বলেছিলাম, তাই সে পত্র লিখেছে। কিন্তু তা আর পারছি কৈ? আমাকে যাবার জন্য লিখেছে। বাড়ী যাই বা কি ক'রে, আর গিয়েই

বা তাকে কি বলুব ?” উমেশচন্দ্র আর কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

অবিনাশ বাবুর হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, “উমেশ বাবু, আপনার ছেলের পত্রখানি আমি দেখ্‌তে পারি কি ? সেখানি আপনার সঙ্গে আছে ?”

উমেশচন্দ্র বলিলেন, “পত্রখানি সঙ্গেই আছে। আপনি অন্নদাতা, আপনাকে দেখাব না কেন ?” এই বলিয়া তিনি পত্রখানি অবিনাশ বাবুর হাতে দিলেন।

অবিনাশ বাবু পত্রখানি পড়িলেন। পত্রে এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

বাবা, আপনি অনেকদিন বাড়ী আসেন নাই। আমরা বাড়ীতে সরস্বতী পূজা করিব, আপনি সেদিন বাড়ী আসিবেন, অবশ্য অবশ্য আসিবেন। সরস্বতী পূজার পর আমাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যাইবেন। খরচ বেশী দিতে হইবে না। মা বলিয়াছেন, হয় খাওয়ার খরচ কম করিয়া, আর না হয়, গোট বিক্রয় করিয়া আমার পড়ার খরচ চালাইবেন। আমি বাড়ী বসিয়াই পড়িতে চাহিয়াছিলাম, মা তাহা শুনিলেন না। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। অবশ্য অবশ্য বাড়ী

আসিবেন। পিসি-মা, মা, ভাল আছেন। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি—

সেবক

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

অবিনাশ বাবু পত্রখানি পড়িলেন। তাহার পর অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। শেষে বলিলেন, "উমেশ বাবু, আপনি কা'ল সকালের গাড়ীতেই বাড়ী যান। বাড়ী থেকে আস্‌বার সময় আপনার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন। ছেলে নিয়ে এসে আপনি আমার বাড়ীতে আপনার বাড়ীর মতই থাক্‌বেন। ছেলের পড়ার ভার আমি নিলাম। আর এ মাস থেকে আপনার মাইনে আমি ত্রিশ টাকা ক'রে দিলাম। এখন বাড়ী চলুন। আপনার ছেলের সরস্বতী পূজার জিনিসপত্র আজ রাত্রেই কিন্‌তে হবে। তার পরে যা হয়, সে আমি ঠিক করব। (ভৃত্যের প্রতি) ওরে, দোকান বন্ধ কর্।"

(৩)

পরদিন প্রাতঃকালে কাপড়-চোপড় ও নানারকম জিনিসপত্র লইয়া উমেশচন্দ্র হাবড়া ষ্টেশনে গেলেন। ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন, যে ট্রেণে তিনি যাইবেন, সেই ট্রেণ চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা

করিয়া পরের ট্রেণে উঠিলেন। মেমারী ষ্টেশনে যখন নামিলেন, তখন বেলা প্রায় সাড়ে-এগারটা। তিনি একটা মুটের মাথায় জিনিসপত্র দিয়া বাড়ী চলিলেন।

এদিকে উমেশচন্দ্রকে সোমবার রাত্রিতে আসিতে না দেখিয়া সকলেই নিরাশ হইয়াছিল। অখিল বলিল, "পিসি-মা, বাবা ত এলেন না, পত্রেরও উত্তর দিলেন না।"

পিসি-মা বলিলেন, "বাবা, তোমার বাবা কা'ল আস্‌বেন।"

মঙ্গলবার আসিল, প্রাতঃকাল হইতে তিনটা গাড়ী চলিয়া গেল। অখিল শুধু বলে, "পিসি-মা, এই গাড়ী-খানি দেখে তবে ঠাকুর মশাইকে পূজোর জন্য ডেকো।"

বেলা যখন এগারটা বাজিয়া গেল, তখন অখিলের পিসি-মা বলিলেন, "অখিল, বোধ হয় দাদার আফিসে ছুটী নেই, তাই তিনি আস্‌তে পারলেন না। বেলাও হ'য়ে গেল, আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই; ঠাকুর মশাইকে ডেকে আনি।"

অখিল মলিন মুখে বলিল, "বাবা এলেন না, তা পূজোর আর দেরী ক'রে কি হবে?"

অখিলের পিসি-মা তখন পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন। পুরোহিত পূজা শেষ করিয়া অখিলকে অঞ্জলি দিতে বলিলেন। যথারীতি মন্ত্রপাঠ করিয়া অখিল অঞ্জলি

দিল। তাহার পর অখিলের পিসি-মা বলিলেন. "মাকে আবার প্রণাম কর।"

অখিল তখন সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা সরস্বতী, আমরা বড় গরীব, আমার লেখাপড়া শেখার উপায় করে দাও। মা সরস্বতী, বাবার ভাল কর।"

ঠিক সেই সময়ে উমেশচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অখিল সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখে তাহার পার্শ্বে তাহার বাবা দাঁড়াইয়া আছেন।

উমেশচন্দ্র সহাস্যবদনে বলিলেন, "অখিল, মা সরস্বতী তোমার পড়ার উপায় ক'রে দিয়েছেন।"

অখিল বলিল, "তা আমি জানি। পিসি-মা বলেছিলেন ভক্তি ক'রে মাকে ডাক্‌লে তিনি কি না শুনে থাক্‌তে পারেন? বাবা, আমি মাকে খুব ভক্তি করে ডেকেছি। কেমন পিসি-মা?"

উমেশচন্দ্র তখন পুত্রকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া নীরবে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

পূজার পোষাক

আমি কায়স্থের ছেলে। আমাদের বাড়ী ইটালীতে। আমার পিতা কলিকাতার একটা ব্যাঙ্কে চাকুরি করিতেন; যাহা বেতন পাইতেন, তাহাতেই আমাদের সংসার চলিয়া যাইত। বাড়ীতে বেশী লোক ছিল না; বাবা, মা, আমি, আর একটি ঝি।

আমি যে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম, সেই বৎসরই বাবা খুব ঘটা করিয়া আমার বিবাহ দিলেন। পল্লীগ্রামের একটি ভদ্রলোকের বয়স্থা সুন্দরী কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইল। বাবা টাকার লোভে এ বিবাহ দেন নাই—আমার বিবাহে তিনি আমার শ্বশুরের নিকট একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই—কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র কায়স্থ-সন্তানের দুঃখে দুঃখিত হইয়াই তিনি আমার বিবাহ দেন। বিবাহের দেড় বৎসর পরে, অর্থাৎ আমার এল, এ, পরীক্ষার পূর্ব্বেই, আমার একটি পুত্রসন্তান হয়। বাবা বড় আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন ধ্রুবলাল।

অল্প বয়সেই পুত্রের পিতা হইয়া আমি পড়াশুনা ত্যাগ করি নাই,—আমি যেমন পুত্রের পিতা হইয়াছিলাম,

তেমনই আমার মত পুত্রেরও পিতা কলেজে ছিলেন। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে যথাক্রমে এল-এ, বি-এ, এম-এ, অবশেষে বি-এল, পর্য্যন্ত পাশ করিলাম। বাবা সংসার চালান, আর ধ্রুবকে লইয়া থাকেন। আমি কলেজে যাই, পড়াশুনা করি, পরীক্ষা দিই, পাশ করি। বাবা খাইতে দেন, পরিতে দেন, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া লেখাপড়া করি—স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা আমাকে ভাবিতে হইত না; চাউলের দর জানিবারও আমার আবশ্যকতা ছিল না; কি দিয়া কেমন করিয়া সংসার চলে, সে চিন্তা আমাকে কোনদিনও করিতে হয় নাই—বাবাও কোন দিন আমাকে তাহা জানিতে দেন নাই। ধ্রুবই বাবার জীবনের ধ্রুবতারা হইয়াছিল; আমার সেই একমাত্র সন্তান।

বি-এল পাশ করিয়া আমি আলিপুরে ওকালতী আরম্ভ করিলাম। বাবার আর একটা খরচ বাড়িল; এখন আমাকে প্রতিদিন ট্রামভাড়া ও জলখাবার ইত্যাদির জন্য আট আনা দিতে হইত। এক বৎসর ওকালতীর পর হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমি ২৭৷৶০ সাতাইশ টাকা এগার আনা রোজগার করিয়াছি। এগার আনা কি করিয়া পাইয়াছিলাম, সে হিসাবটা এইস্থানে দিই। এক

দিন এক মক্কেলের কাজের জন্য আমাকে শ্যামবাজার যাইতে হয়; তিনি এক টাকা গাড়ী ভাড়া দেন, আমি পাঁচ আনা ট্রামভাড়া খরচ করিয়া এগার আনা বাঁচাই এবং তাহা আমার ওকালতীর আয়ের খাতায় জমা করি। —এমন সম্মানজনক ওকালতী অনেকেই করেন, আমিই কেবল মুখ ফুটিয়া বলিলাম!

মনে করিয়াছিলাম এমনই করিয়া দিন কাটিবে। বাবা যে অমর-বর লাভ করিয়া পৃথিবীতে আসেন নাই, এ কথা আমার স্মরণ ছিল না। আমি মনে করিতাম, বাবা বহুকাল —আমার দরকার ও সুবিধা মত—বাঁচিয়া থাকিবেন, আর আমি ধীরে ধীরে বড় উকীল হইব—শেষে চাই কি হঠাৎ একদিন হাইকোর্টের বিচারাসনও অলঙ্কৃত করিতে পারি; সংসারের ভাবনা বাবা ভাবুন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন চট্ করিয়া আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বৈশাখ মাসের একদিন অপরাহ্নে বাবা অসুস্থ হইয়া আফিস হইতে বাড়ীতে আসিলেন। সেই রাত্রিতেই তাঁহার খুব জ্বর হইল: পরদিন ডাক্তার ডাকিলাম। ডাক্তার ঔষধ দিলেন, কিন্তু জ্বর কমিল না; ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে সাহেব-ডাক্তার লইয়া আসিলাম। ডাক্তার সাহেব বলিলেন এ জ্বর সহজ নহে। চিকিৎসকের কথা শুনিয়া

আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম, প্রাণপণে বাবার চিকিৎসা করাইলাম। কিছুতেই কিছু হইল না—তিন দিনের জ্বরে বাবা আমাদের মায়া কাটাইয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন।

বাবা একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা সমস্তই ব্যয় করিতেন; তিনি কোন দিন ভবিষ্যতের চিন্তা করেন নাই। বোধ হয় তিনি মনে করিয়াছিলেন, যাহার এম-এ, বি-এল, ছেলে আছে; সে আবার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিবে কেন? তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি প্রতিপালন করিয়াছিলেন—আমাকে যথাসম্ভব উচ্চশিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

বাবা ত স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আমি এখন সংসার চালাই কি করিয়া? কলিকাতা সহরের খরচ কম নহে। মায়ের নিকট শুনিলাম, বাবা দেড় শত টাকা বেতনেও অনেক সময় কুলাইয়া উঠিতে পারিতেন না,—আর আমি এক বৎসরে সাতাইশ টাকা এগার আনা উপার্জ্জন করিয়াছি; আমার উপার্জ্জনের টাকা খায় কে? মাকে বলিলাম, ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া মাষ্টারী করি, নতুবা সংসার চলিবে কি করিয়া? মা, বলিলেন "তা কি হয়? কর্ত্তা সর্ব্বদাই বলিতেন যে, তুমি যদি আর কিছুদিন কষ্ট

করিয়া আলিপুরে থাক, তাহা হইলে তোমার খুব পসার হইবে। এখন কি হঠাৎ এমন ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ? সংসারের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না ; যেমন করিয়া হউক, সংসার চলিয়া যাইবে।" কয়েকখানি অলঙ্কার ব্যতীত মায়ের হাতে নগদ টাকা কিছুই ছিল না ; সেই অলঙ্কারের ভরসাতেই তিনি বলিলেন "যেমন করিয়া হউক সংসার চলিয়া যাইবে।" আমি আর কোন কথা বলিলাম না।

আমাদের বাড়ীখানি খুব বড় নহে। বাহিরের দিকে দুইটা ঘর আছে,—একটা বৈঠকখানা, আর একটা আমার পড়িবার ঘর। এখন আর দুইটা ঘরের দরকার ছিল না। মাকে কহিলাম, একটা ঘর ভাড়া দিই। মা প্রথমে আপত্তি করিলেন ; আমি অনেক বুঝাইয়া বলায় শেষে তিনি স্বীকৃত হইলেন। এক দোকানদার মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় ঘরটা লইল। দশ টাকা আয়ের ত পথ হইল। এবার মাকে না বলিয়াই আর একটা কাজ করিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একটি ছেলেকে পড়াইবার ভার লইলাম, বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা স্থির হইল। সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হই, সেই সময়ে পড়াইয়া আসি। মাস গেলে ২৫৲ টাকা পাই। টাকাগুলি মায়ের হাতে

দিই; মা মনে করেন, উহা বুঝি আমার ওকালতীর উপার্জ্জন। বাড়ীতে খরচপত্রের কষ্ট হয়; কিন্তু কি করিব, কোন উপায়ই দেখি না। পূর্ব্বে পাঁচ আনা ট্রাম ভাড়া দিতাম, এখন বাড়ী হইতে ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাই, সেখানে ট্রামে চড়ি। ক্ষুধায় কাতর হইলেও এক পয়সার খাবার কিনিয়া খাই না—সে পয়সাটা থাকিলে যে আমার ধ্রুবের জলখাবারের সাহায্য হইবে। হায়! এম-এ, বি-এল, উকিলের ভাগ্য!

বৈশাখ মাসে বাবা মারা যান, তাহার পর হইতেই আমাদের এই অবস্থা। দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাস আসিল—তখনও পূজার প্রায় পনর দিন বাকী; কিন্তু কলিকাতা সহরে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দোকানদারেরা নূতন নূতন পণ্যদ্রব্যে দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে। যাহার পয়সা আছে, সে নানা আবশ্যক অনাবশ্যক দ্রব্য কিনিতেছে; জুতা জামা অলঙ্কারের অর্ডার দিতেছে; আর আমার মত যাহার পয়সা নাই অথচ আমার ধ্রুবের মত পুত্র আছে, সে সুসজ্জিত দোকানের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত হৃদয়ে চলিয়া যাইতেছে।

একদিন অপরাহ্ণ কালে আলিপুর হইতে ফিরিবার সময়

পূজার পোষাক

বহুবাজার ষ্ট্রীট দিয়া আসিতেছিলাম। পোষাকের দোকানগুলির কি শোভা হইয়াছে! কত রকমের পোষাক দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সজ্জিত রহিয়াছে! যে ভাল জিনিসটা দেখি, তাহাই আমার ধ্রুবের জন্য কিনিতে ইচ্ছা হয়,—আমার যে ঐ একই ছেলে। পূজার সময় কতজন ছেলে-মেয়ের জন্য কত কি কিনিতেছেন, আর আমি আমার ধ্রুবের জন্য কিছুই যে কিনিতে পারিব, তাহার কোন সম্ভাবনাই দেখিতে পাইলাম না। যে দুই দশ টাকা আনিয়া দিই, আর মা গোপনে অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যাহা পান, তাহাতে যে সংসারই চলে না। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে আর দোকানের সাজসজ্জা দেখিতে দেখিতে বিষণ্ণমুখে কাতরহৃদয়ে সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিলাম।

বাড়ীর দ্বারে প্রবেশ করিতেই দেখি ধ্রুব একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া এবং ততোধিক ময়লা একটা জামা গায় দিয়া অতি মলিনমুখে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মলিন মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ধ্রুব, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?" সে অতি কাতরভাবে বলিল, "বাবা, আমার আজ জ্বর হয়েছে।'' আমি বলিলাম, "কখন জ্বর হ'ল? আমি ত বেরিয়ে যাবার সময় তোমাকে ভালই দেখে

গিয়েছিলাম।” ধ্রুব বলিল, “সকাল থেকেই জ্বরের মত হয়েছিল; তুমি বেরিয়ে গেলেই জ্বর হয়েছে।” আমি বলিলাম, “এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ঠাণ্ডা লাগলে যে জ্বর বাড়বে।” ধ্রুব বলিল, “ও বাড়ীর সুবোধের বাবা তার জন্য বেশ ভাল একটা পোষাক এনেছে, সুবোধ তাই আমাকে দেখাতে এনেছিল। বাবা! আমাকে ঐ রকম একটা পোষাক কিনে দেবে? আর বছর দাদাবাবু যেটা কিনে দিয়েছিলেন, সেটা যে ছোট হয়ে গিয়েছে।”

আমিও যে আজ ঐ কথাই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিয়াছি; আর আজ মলিন মুখে আমার ধ্রুব ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল! আমি কি উত্তর দিব? আমি ত এ কথা বলিতে পারিব না যে “তোমাকে ঐ রকম একটা পোষাক কিনে দেব”—আমি ত আমার ছেলেকে মিথ্যা আশা দিতে পারিব না—আমি ত শেষে তাহাকে নিরাশ করিতে পারিব না—আমি ত ছেলের কাছে মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না—তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষা দিতে পারিব না। আমি কি উত্তর দিব? আমি কথা বলিতে পারিলাম না, আমার কথা বন্ধ হইয়া আসিল। আমি তখন আমার সেই ছয় বৎসরের ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইলাম—তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। যে কষ্ট, যে যন্ত্রণা এতদিন বুকের

মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহা নয়নজলে অভিব্যক্ত হইল—আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার চক্ষের জল দুই চারি ফোঁটা ধ্রুবের মুখে পড়িল। ধ্রুব আমার মুখের দিকে চাহিল—ছয় বৎসরের ছেলে আমার দুঃখ বুঝিতে পারিল। সে অতি কাতরস্বরে বলিল, "বাবা, আমি পোষাক চাইনে, আমি কাপড়ও চাই না।" ধ্রুবের কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, আমার চক্ষু দিয়া আরও বেগে জল বাহির হইতে লাগিল। হায় অদৃষ্ট!

অনেক কষ্টে চক্ষের জল সংবরণ করিয়া ধ্রুবকে কোলে লইয়া বাড়ীর মধ্যে গেলাম। সেই দুঃখের কাহিনী আর কাহাকেও বলিলাম না, ধ্রুবও সে কথা তুলিল না।

সেই রাত্রেই ধ্রুবের জ্বর বাড়িল। পাড়ায় একজন ডাক্তার ছিলেন, রাত্রেই তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম। ডাক্তার ঔষধ দিলেন; বলিলেন, "জ্বরটা কিছু বেশী হয়েচে; তা কোন ভয় নেই, দুই এক দিনেই সেরে যাবে।" জ্বর ছাড়িল না, ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, অন্য উপসর্গও দেখা দিল। মায়ের আদেশে সাহেব ডাক্তার আনিলাম। মায়ের ও স্ত্রীর যে দুই চারিখানি অলঙ্কার ছিল, তাহা বন্ধক দিয়া চিকিৎসা চালাইতে লাগিলাম; কলিকাতার

যত বড় বড় ডাক্তার ছিল সকলকেই আনিতে লাগিলাম। কিছুতেই কিছু হইল না। সপ্তম দিনে বিকার দেখা দিল—বুঝিলাম ধ্রুবকে বাঁচাইতে পারিলাম না। বিকারের ঘোরে ধ্রুব শুধু বলে, "বাবা, আমি পোষাক চাইনে,.. বাবা! আমি পোষাক চাইনে।" এ যে আমার পক্ষে শক্তিশেল!

আটদিনের দিন বেলা আটটার সময় ধ্রুব একবার চক্ষু চাহিল—অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "বাবা" আমি নিকটেই বসিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, "কি বাবা!" ধ্রুব তখন ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা! আমি পোষাক চাইনে।" তাহার পরেই সব শেষ!

তাহার পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আবার পূজা আসিতেছে। আমি এখন শুধু শুনিতে পাই, ধ্রুব যেন বলিতেছে "বাবা! আমি পোষাক চাইনে।" হায় ভগবান্! কতদিনে এ যন্ত্রণার অবসান হইবে?

সম্পূর্ণ।